ISSN 0036-374X

সমতট

189

জুলাই-সেপ্টেম্বর 2016

প্রকাশন

বহুবৃত্তিক সমতটের 48 বর্ষ সংখ্যা 1 ❑ মূল্য 20 টাকা

সমতট :
189
জুলাই-সেপ্টেম্বর 2016
48 **বর্ষ** **সংখ্যা-1**

সম্পাদকমণ্ডলী : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত ছবি কুণ্ডু মনোজ রায় স্নিগ্ধা সেন সৌমনা দাশগুপ্ত **উপদেষ্টামণ্ডলী :** ভাস্কর বসু সুব্রতকুমার ঘোষ মীনা দাঁ অনিন্দ্য রুদ্র সুমিতা চক্রবর্তী পিনাকী ভাদুড়ী দেবনারায়ণ ইন্দু অরুণকুমার চক্রবর্তী অভীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় এণাক্ষী মজুমদার অভিজিৎ মুখার্জি কালাচাঁদ ঘোষ অয়ন ঘোষ। **সভাপতি:** দেবকুমার সাহা

সম্পাদকীয় : ।। এক।। ত্রাস/দেবনারায়ণ ইন্দু 3
।। দুই।। সত্তরতম স্বাধীনতা দিবস ও কাশ্মীর/মীনা দাঁ 6

সালতামামি : 47তম বর্ষের সমতট/মনোজ রায় 14

প্রবন্ধ ও গদ্যরচনা :
ভারতের আমজনতার জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি / রবীন মজুমদার 23
যুক্তি, তর্ক মীমাংসা / সুভাষ রায় 38
'উত্তরণ'-এর যাত্রাপথ / মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় 42
দেড়শো বছরের অন্ধকারে : মেঘনাদবধ কাব্য / গোবিন্দ ভট্টাচার্য 60
আনপড়ের ডায়েরি / অর্ঘ্য দত্ত 63
মণিলাল ভৌমিক / কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 69

প্রযুক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ :
বাড়ির ছাদ লিক্‌প্রুফের আধুনিক উপায় / অনিমেষ কুমার সাহা 109

গল্প : এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টার্জ / মহাশ্বেতা দেবী 72
মা / সলিল চট্টোপাধ্যায় 84
টাইম বাবু / বদিউর রহমান 88

কবিতা : অরুণকুমার সরকার, সৌভিক দত্ত, শেলি চট্টোপাধ্যায়, সুগত চৌধুরী, কৌশিক দাশগুপ্ত, রবি রায় 95

প্রতিবেদন : অবলুপ্ত পার্সী সম্প্রদায় / প্রণবকুমার দত্ত 100

পুস্তক আলোচনা : সমালোচক—মনোজ রায় / 107
।। এক।। ঘাস ফড়িং / অলোক ঘোষ ।। দুই।। চিত্রপটে আঁকা / চন্দনা দত্ত

আনন্দ সংবাদ : ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ 113

চিঠি : চিঠি/অনিন্দ্য রুদ্র 114

সমতটের প্রবীণাবাস সম্বন্ধীয় পুস্তিকা : আনন্দকানন

প্রচ্ছদ শিল্পী : বিপিন গোস্বামী

বিজ্ঞপ্তি

সমতটের 47 বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান
স্থান : কালীঘাট পার্কের রবীন্দ্রচর্চা ভবন
সময় : সন্ধ্যা 5.30
তারিখ : প্রতিবারের মতো জানুয়ারি 2017-র দ্বিতীয় রবিবার।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

- রচনার মাথায় 'কেবল সমতটের জন্য' কথাটা লিখবেন এবং রচনার নিচে স্পষ্টাক্ষরে লেখকের **নাম, স্বাক্ষর, ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ সমতট অফিসে পাঠাবেন।**
- রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পিঠে, বাঁদিকে অন্তত দেড় ইঞ্চি মার্জিন ছেড়ে টাইপ করে বা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। *গদ্য রচনার ক্ষেত্রেই* শুধু মোট শব্দ সংখ্যা উল্লেখ্য। নকল রেখে রচনার মূল কপি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ত্রৈমাসিক সমতটে প্রকাশিত যে কোনো রচনা বা চিত্র বিনামূল্যে সমতটের কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত করার অধিকার সমতটের থাকবে।
- প্রবন্ধের ক্ষেত্রে **প্রাসঙ্গিক উল্লেখপঞ্জি এই ক্রমানুসারে দিতে হবে** : (ক) লেখকের নাম, (খ) বই/রচনার নাম, (গ) প্রকাশকের নাম, স্থান ও প্রকাশ কাল, (ঘ) পুস্তক হলে মূল্য।
- **কবিতা :** আপাতত কিছুকাল কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করবেন দেবকুমার সাহা।

সমতটের দাতাদের ধন্যবাদ

জুলাই-সেপ্টেম্বর 2016 সময়কালে সমতট দফতরে প্রাপ্ত দান :

প্রকাশন বিভাগ : সূর্য ভট্টাচার্য-₹ 500, অনিরুদ্ধ গুপ্ত-₹ 5000

প্রবীণাবাস আনন্দ কানন : (বিল্ডিং ফান্ড) : প্রয়াত অম্লান দত্ত, ₹ 10,18,000

নতুন বিশেষ আজীবন সদস্য : সুনন্দন নারায়ণ বসু

(বি. দ্র. : ভারতীয় দাতারা তাঁদের PAN No. জানাবেন।)

সমতট-এর ঠিকানা : 172 রাসবিহারী এভিনিউ, **নন্দনা** 302, কলকাতা 700 029

মোবাইল - 98304 58933 / 98318 88845, **ফোন** - TATA 6561 9870

তাছাড়া আমাদের পাবেন : samatat.blogspot.com

ই-মেল : chhabik8@gmail.com ওয়েবসাইট : samatat sanstha.in

পত্রিকার চাঁদার/দানের হার

সমতট সংস্থা : পেট্রন—₹25,000 (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ₹100,000 টাকা); পেট্রনরা বিনামূল্যে সমতটের সমস্ত অধুনা প্রকাশিত বই ও পত্রিকা পাবেন।

ত্রৈমাসিক সমতটের 'আজীবন সদস্য' চাঁদা : দেশে ₹5,000; বিদেশে ₹20,000 অধিকার : বিশেষ আজীবন সদস্যরা বিনামূল্যে ত্রৈমাসিক সমতট পত্রিকা এবং 25% হ্রাসমূল্যে সমতটের অধুনা লভ্য সব বই পাবেন (ডাক খরচ আলাদা)।

পত্রিকার চাঁদা স্বদেশে : প্রতিষ্ঠানগত সদস্য চাঁদা : 1 বছর—190 টাকা 2 বছর 380 টাকা।

ব্যক্তিগত : সডাক গ্রাহক চাঁদার হার : 2 বছর/3 বছর—250 টাকা/380 টাকা।*

: অফিস থেকে হাতে নিলে : 2 বছর/3 বছর—160 টাকা/250 টাকা।*

* চাঁদা, ফোন নং ও ডাক-ঠিকানা সহ, কমপক্ষে 2 বছরের জন্য পাঠাবেন।

চাঁদা A/c Payee চেক্-য়ে আমাদের অফিসের ঠিকানায় বা, আমাদের UCO Bank-এর SB A/c-14810100004369-য়ে পাঠাতে পারেন Branch IFS Code : UCBA 0001481 —সেক্ষেত্রে আলাদা চিঠিতে নাম, ফোন নং, ঠিকানা সহ কতো টাকা, কবে কেন পাঠিয়েছেন জানাবেন।

।। এক।।

ত্রাস

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে পরপর তিনটি অগাস্ট মাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। 1945 এর 6 ও 9 অগাস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করা হয়। 1946 এর 16 অগাস্ট তদানীন্তন বাঙলায় মুসলিম দেশ গঠনের দাবিতে Direct Action শুরু হয় যা সারা বাঙলায় চরম ত্রাস সঞ্চার করে। 1947 এর 14/15 অগাস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার পতনের শুরু হয়, ব্রিটিশ সম্রাটের মুকুটমণি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন দিয়ে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল কিন্তু খণ্ডিত হয়ে— ভুল ও মিথ্যা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। এর ফলে এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম রক্তক্ষয়ী হানাহানি। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালো। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য দেশান্তরে যেতে বাধ্য হল। Moses ইসরায়েল ছেড়ে অনুগামীদের নিয়ে মিশরে চলে যান অগাস্ট মাসে। অগাস্ট ত্রাসের, উদ্বাস্তু হবার মাস। (*বাইবেল দ্বিতীয় অধ্যায়*—Exodus)

ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির শুরু থেকে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সার-ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত-বৃদ্ধি এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্রমশ বেশি শক্তিশালী ও বিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা। এরই পরিণতি এই তিনটি অগাস্টের ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানিতে Auschwitz-এ উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের নামে গণহত্যা, চীন-জাপানের যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্টালিনের purge, ভারত-পাকিস্তানে স্বাধীনতা-উত্তর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পর United Nation-এর মাধ্যমে বড় যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা খানিকটা সফল হয়েছে। কিন্তু, সেটা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক মারাত্মক ক্ষমতার ভয়েই। কিন্তু মাঝারি যুদ্ধ চলতেই থাকে—কোরিয়া, ভিয়েতনাম, নাইজেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে যাবার পর পূর্ব ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদি। এর সঙ্গে চলতে থাকে ঠাণ্ডা লড়াই—পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং রাশিয়ার মধ্যে।

1989-এ বার্লিনের দেওয়াল ভেঙে ফেলা এবং 1991-এ USSR ভেঙে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল একটা শঙ্কাহীন শান্তির সময় আসবে। কিন্তু তা হল না। আরম্ভ হল বিক্ষিপ্ত হলেও একেবারে অবিচ্ছিন্ন নয়---সন্ত্রাসবাদী হানা---পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে—ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারত উপমহাদেশ হয়ে আমেরিকায় নিউইয়র্ক পর্যন্ত। ইয়োরোপে এই পর্যায়ে একটু দেরিতে এলেও গত দুতিন বছরে বারবার হয়ে চলেছে লন্ডন, ব্রাসেলস, প্যারিস, ইত্যাদি শহরে। ভারত উপমহাদেশে এই পর্যায়ের শুরু 1992 তে বাবরি মসজিদ ভাঙা, 1993'র মার্চ মাসে মুম্বাইতে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ তারপর মালেগাঁও, পুনেতে। তারপর দিল্লীতে সংসদভবন আক্রমণ, কোলকাতায় USIS ভবনে হানা, ইত্যাদি। এরই সঙ্গে সঙ্গে চলে আফগানিস্তানে Bumyan বুদ্ধ মুর্তি ধ্বংস, অদূর অতীতে মধ্যপ্রাচ্যে মানব সভ্যতার বেশ কিছু প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংস ইত্যাদি। Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) সংগঠিত হবার পর তো তারা পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের আক্রমণে জনসাধারণ তো বটেই, মানুষের শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিশাল নিদর্শনগুলিও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাদ পড়ছে না হাসপাতাল। সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি জঙ্গি হানা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও একান্তই অমানবিক। এগুলি হল নীস (NICE)-এ বাস্তিল দিবসে (14 July) উৎসবপালনরত মানুষের মধ্যে ট্রাক চালিয়ে দেওয়া, ঢাকায় Holey Artisan Bakery-তে আহাররত মানুষদের বন্দী করে শ্বাসনালী ছেদ করে হত্যা এবং কোয়েটায় হাসপাতালে উপর্যুপরি বোমাবর্ষণ—দ্বিতীয় দফায় বোমা বর্ষণ হয় যখন প্রথম বোমাবর্ষণে আহতদের শুশ্রূষা করার চেষ্টা হচ্ছে। এই অমানবিক নারকীয় হাঙ্গামার কারণ অনুধাবন করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন এ হল সাম্রাজ্যবাদী আমলের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া। এই হাঙ্গামাগুলি অর্থনৈতিক পশ্চাদপরতার কারণে নয়—কেননা, হাঙ্গামাকারীদের অনেকেই শিক্ষিত ও আর্থিক সম্পদ সম্পন্ন সমাজের লোক। এবং সবিশেষ লক্ষণীয়, সর্বত্র এক বিশেষ ধর্মের ধর্মানুগামীরা এই সব হামলা করছেন। সন্ত্রাসের কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে—এই পত্রিকাতেও। এখন প্রয়োজন এসেছে সন্ত্রাস বন্ধ করার।

সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে যদি জাতি ধর্ম ভাষা দেশ নির্বিশেষে এই সন্ত্রাসকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয়। এই ভর্ৎসনা আসা দরকার ঐ বিশেষ ধর্মের নেতাদের কাছ থেকে। ঐ ধর্মানুসারী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে। যাঁরা এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করবেন তাঁদের নিশ্চয়ই বিরোধিদের ভীতিপ্রদর্শনের মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু, এই ভীতিপ্রদর্শন কিছুদিন পরেই নিস্তেজ হবে। মানবতার জয় হবে। এই বিশেষ ধর্মের

অনুশাসন এতই জোরালো যে যুক্তিবাদী গোষ্ঠিও সেজন্য গড়ে ওঠেনি এই ধর্মাবলম্বীদের মাঝে। তবে আশার কথা, সম্প্রতি ঐ ধর্মীয় এক বিশিষ্ট যাজক এই ধর্মাবলম্বীদের এক সভায় এই সন্ত্রাসের নিন্দা করেন এবং সন্ত্রাস বন্ধ করার ডাক দেন। এঁরা যদি ঐ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার উদ্রেক করে তাঁদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সত্যিকারের শান্তির পথে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল হবে।

আর দু'টি কথা—

এক—মানবসভ্যতার নিদর্শন কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীর সম্পত্তি নয়। তাকে ধ্বংস করা মানে নিজেদেরই উৎসকে ধ্বংস করা। ইয়োরোপে যেমন internecine war বন্ধ হয়েছে, প্যারিসে বোমা বর্ষণ না করার চুক্তি হয়েছে যাতে সভ্যতার বিকাশের চিহ্নগুলি সুরক্ষিত থাকে, যেমনভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ-যুগের অবসানের পরে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা ও জনগণের সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন, তেমনি আসুন আমরা অঙ্গীকার করি প্রকৃতিকে ও মানুষের কীর্তিকে আর ধ্বংস করবো না—তা সে ভ্যাটিক্যানের সিস্টিন চ্যাপেল, আগ্রার তাজমহল, বা ইফেল টাওয়ার যাই হোক না কেন।

দুই—এই বিষাদময় দৃশ্যের মাঝে একটি একান্ত বিষণ্ণ কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ একটি রক্তাক্ত দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে। তা হলো—সৈয়দ ফায়াজ। Holey Artisan বেকারিতে বাঙলাদেশি যুবক সৈয়দ ফায়াজ আয়াজ হোসেন ছিলেন তাঁর দুই বান্ধবীকে নিয়ে। সন্ত্রাসবাদীরা ফায়াজকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু সে তার দুই বান্ধবীকে (যারা ঐ বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছিল না) বাদ দিয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে রাজি হয়নি। মানুষের কাছে নিজের জীবন সবচেয়ে প্রিয়। সে জীবন সুযোগ পেয়েও না বাঁচিয়ে, তার বন্ধুদের সঙ্গে একই সঙ্গে প্রাণ দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন পরে গেল তা লায়লা মজনু, রোমিও জুলিয়েট—এসব কাহিনীর চেয়েও অনেক দামি। আদর্শের জন্য যে প্রাণ বিসর্জন সেই ত্যাগই সব থেকে বড় ত্যাগ।

দেবনারায়ণ ইন্দু

।। দুই।।

সত্তরতম স্বাধীনতাদিবস ও কাশ্মীর

আজাদ আহমেদ। আমার কাশ্মীরি বন্ধু। বন্ধুত্ব সেই আশির দশকের গোড়ায় পুনার ডেকান কলেজে পড়ার দিনগুলো থেকে। সুভদ্র, বিনয়ী, নির্বিবাদী, নির্ভেজাল মানুষ। আজ সকাল থেকে অন্তত পঞ্চাশটা নানান কিসিমের সুখী স্বাধীনতার সুখবার্তা পাবার পর আর থাকতে না পেরে ফোন করলাম আজাদকে, অন্তত যদি মুঠোখানেকও সুখসংবাদ পাওয়া যায় সেই অসম্ভবের আশায়। কিন্তু না। আজ সাঁইত্রিশতম দিন, শ্রীনগর অচল, জীবন থমকে গেছে, আনন্দ উবে গেছে, নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন, কাশ্মীর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। কথা হল চৌত্রিশ মিনিট। দু'মাস আগে পর্যন্ত ফোনকলগুলো এত লম্বা হতো না। শুধু দরকারি কথা, কেমন আছো আর টেক কেয়ার-এই সীমিত থাকত কথোপকথন। কিন্তু এখন সময়ের সীমা উপচে বয়ে চলে অনর্গল কথাবার্তা। সাঁইত্রিশ দিন ধরে দু'টি স্কুলপড়ুয়া ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আটকা এক অতি ব্যস্ত অধ্যাপক। দিনে কয়েকঘন্টার কার্ফু শিথিল হলে মূলত খাদ্যান্বেষণে বেরোনো। তাও ছেলেদের বা স্ত্রীকে রাস্তায় যেতে দেন না, ভরসা নেই বেরোলে তারা অক্ষত অবস্থায় ফিরবে কিনা! নিজের নিরাপত্তার মানও তথৈবচ, তবু প্রাণে ধরে অন্যদের বাইরে ছাড়তে পারেন না। আর ঘরের ভিতরের জীবনে ইন্টারনেট নেই। বন্ধ। রাষ্ট্রের ফতোয়ায়। অবশ্য এই ঊষর যাপনের সঙ্গে অধ্যাপনার কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। শ্রীনগরের প্রতিটি মানুষের যাপনই এই মুহূর্তে একই রকম দমবন্ধ করা। প্রতিদিনই স্বাভাবিকের থেকে ক্রমশ দূরবর্তী। এই পরিস্থিতিতে কথার অবরুদ্ধ স্রোত বইতে থাকে ফোনের ওপার থেকে। আমি মূলত শ্রোতা। এইটুকুই আমার পাশে থাকার ক্ষমতা, হাত বাড়ানোর প্রয়াস।

আজ অবধি খবর শহরের দৈনন্দিন জীবনের কোনো উন্নতি হয় নি। সেই পোস্টারবয় বুরহান ওয়ানিকে খুন করার দিন থেকে আজ অবধি কাশ্মীরে নিহতের সংখ্যা ষাট ছাড়িয়েছে, আহত প্রায় সাড়ে চারহাজার আর চোখ খুইয়েছে প্রায় তিনশো জন। এই তিনশোর বয়স বারো থেকে কুড়ির মধ্যে। আহত-নিহত সকলেই অসামরিক সাধারণ জনগণ। আমরা প্রায় কুড়িদিন আগের কাগজে পড়েছি ছররাবন্দুক বা পেলেটগান ব্যবহারের কুফল। এও জেনেছি যে মোদি সরকার নাকি পেলেটের বদলে রাবার বুলেট

বা অন্য কিছু ব্যবহারের ভাবনাচিন্তা করছে; কিন্তু কাজে সেসব কিছুই এখনও হয়নি। সংবাদমাধ্যমে দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পাকিস্তানকে দোষারোপের কাজে ব্যস্ত, পেলেটগান নিয়ে সিদ্ধান্ত ও তার প্রয়োগ সরকারের প্রায়রিটি লিস্টের ওপরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও কাশ্মীরের অধুনা মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ও তাঁর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি মোদি সরকারের রাজনৈতিক বন্ধু! সেই বন্ধুরাজ্যে পেলেটগানের ভূমিকা কী? পেলেটগান অন্যান্য ধরনের বন্দুক-রিভলবার-পিস্তলের মতো মারণাস্ত্র বলে চিহ্নিত নয়। কিন্তু কার্যত এটি তিলে তিলে মারণাস্ত্র। অন্যান্য গুলি শরীরে ঢুকলে প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করে বের করা যায়। কিন্তু পেলেট বের করা যায় না। শরীরে ঢুকে ফরেনবডি হয়ে রাজত্ব করে, শরীরকে তিল তিল করে পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আর চোখে ঢুকলে তো বাকি জীবন অন্ধকার! পেলেটগানের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। 2015-র মিশর। মিলিটারি শাসনব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, নেহাৎই অগণতান্ত্রিক। অন্তত আমাদের ভারতীয় মাপকাঠিতে। 24 জানুয়ারি কায়রো শহরে এক নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে শাইমা আল-সাবাঘ নামে 31বছরের এক মহিলা সোশাল অ্যাক্টিভিস্ট পুলিশের ছোঁড়া বার্ডশটে নিহত হন। বার্ডশট আর পেলেটগান একই গোত্রের নন-লেথাল অস্ত্র বলে স্বীকৃত। তবুও এই অগণতান্ত্রিক দেশেও ওই হত্যাকারী পুলিশ অফিসারের খুনের দায়ে পনেরো বছরের কারাদন্ড হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে বিচারপর্ব কত দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বৃহত্তম নমস্য গণতন্ত্রে বিচার তো দূরের কথা, রাজনীতির ঘোড়েল হাওয়া এখনও টনকটিও নড়াতে পারেনি নয়, দেয়নি। শুধুই চলছে ঘোলা জলে মাছ ধরার খেলা—মাছের নাম পাকিস্তান! আন্তর্জাতিক বাজারে দামী সওদা, তবে এই আভ্যন্তরীণ মারণসমস্যার সমাধানে নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক। পেলেটগানের ব্যাপারে আইন করা বা বদলানো তো দুরস্ত, যেটুকু আইন আছে—যেমন পেলেগান নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সিংগল মোডে ব্যবহার হবে, কোমরের ওপরে তাক করা যাবে না ইত্যাদি—সেটুকুও ওই ঘোলা জলের ঘূর্ণিতে নিশ্চিহ্ন! এখানে পুলিশের হাতের অস্ত্র ঝাঁকে ঝাঁকে পেলেট ওগরায় অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, তাই সেগুলো ঢুকে যায় শরীরের বুকে-পিঠে-চোখে যেখানে সেখানে। তবে আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করলেও পেলেটগান ব্যবহারের পিছনে এক ধরনের গণতান্ত্রিকতা অবশ্য কাজ করে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার সময় পুলিশের দায়িত্ব তাকে সশস্ত্র সহিংস প্রতিবাদী জনতা, নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী জনতা ও সাধারণ পথচলতি জনতার মধ্যে তফাৎ করা। এবং এই তফাৎ অনুযায়ী নিজেদের পন্থা নির্ধারণ করা। দিনবিশেষে এই তফাৎ করার কাজে পুলিশের মিলিটারির ভুল হতেই পারে। কিন্তু প্রতিদিনই সাধারণ নিরীহ মানুষ,

পুরুষ-মহিলা-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, আহত-নিহতের তালিকায় উঠে যাচ্ছে—এটা কি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হিসেবে কোনোভাবে প্রতিষ্ঠাযোগ্য ঘটনার পরম্পরা তো বলছে যে তফাৎ করার কাজ নয়, তফাৎ করার দায়িত্বটাই ভুলে গিয়ে শাসকের প্রতিনিধিরা সকলেই এক নির্বিশেষ গণতান্ত্রিক চোখে বিচার করছে!

শুধু এটুকুই নয়, আরো অনেক রকম তফাতের সীমারেখা লঙ্ঘন হচ্ছে ও হয়েছে বারবার। জঙ্গি বা টেরারিস্ট শব্দটার অপব্যবহার। যে হত্যার বিরুদ্ধে জনতার প্রতিবাদ হয় সেই সব নিহতই ভারত সরকারের মতে জঙ্গি! যে হত্যার প্রতিবাদে গত 8 জুলাই থেকে কাশ্মীর উত্তাল সেই নিহতের নাম বুরহান ওয়ানি বয়স 21 বা 22। কাশ্মীরের অসামরিক আমজনতার প্রশ্ন—কেন বুরহানকে হত্যা করা হল? কেন তাকে বন্দি করা হল না? তার হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলার কোনো অভিযোগ বা মামলা নেই। এমতাবস্থায় কি কাউকে গুলি করে মেরে ফেলা যায়? ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর বয়ান অনুযায়ী বুরহানের মৃত্যু হয়েছে এনকাউন্টারে। আগের শতাব্দীর সত্তরের দশকে, নকশালি সময়ে, আমরাও তো কম এনকাউন্টারের কথা শুনিনি! পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত্যু! এনকাউন্টারের দু'টো টাইপ— প্ল্যানড আর ফেক। রাষ্ট্রীয় রির্পোটে এই টাইপের উল্লেখ যে থাকতো না তা তো আমাদের এত তাড়াতাড়ি ভোলার কথা নয়। বুরহানের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে ঘটনাটি প্ল্যানড এনকাউন্টার বলেই বর্ণিত, রাষ্ট্র যাই বলুক। বুরহানের শেষকৃত্যে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা সত্বেও পঞ্চাশহাজার জনসমাবেশ হয়েছিল। কেন? এরা কি সকলেই জঙ্গি, নাকি জঙ্গীয়ানার সমর্থক? সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে এটুকু অন্তত আন্দাজ করা যায় যে এই প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি হ্যাঁ বা না হওয়া সম্ভব নয়। কে এই বুরহান ওয়ানি? বুরহান একজন আজাদ কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখা হিজবুল মজাহিদিনের সদস্য, কমান্ডার। পাকিস্তানি কাশ্মীর নয়, আজাদ কাশ্মীর! কী করত সে? সে মূলত সোশাল মিডিয়ায় কাশ্মীরের ভারতীয় আইন প্রয়োগ, ভারতীয় মিলিটারি ও পুলিশী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত, ভিডিও পোস্ট করত, যুবসমাজকে এই অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, হাতে অস্ত্র তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করত। বুরহান কখনও টেররিস্টদের মতো মুখ ঢেকে বা পরিচয় গোপন করে নিজের কাজকর্ম চালায় নি। সে খোলাখুলি ভারতীয় অপশাসনের তীব্র সমালোচনা করে সকলকে তার প্রতিবাদে সামিল হতে আহ্বান করেছে। সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলার হিম্মত দেখিয়েছে। কাশ্মীরের আমজনতা, বিশেষত কিশোর-যুবকদের ওপর তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই গভীর প্রভাবের কৃতিত্ব অবশ্য বুরহানের একার নয়। কাশ্মীরের মানুষজনও নানান ধরনের ভারতীয়

উৎপাত-অবহেলা-অসাম্যের বাস্তবতায় নিত্য তিতিবিরক্ত ছিল। জমি তৈরি ছিল বলেই বুরহানের কার্যকলাপ ভাইরাল হয়ে উঠত। সে নিজেও জনপ্রিয় ছিল। মানুষ তাকে পোস্টারবয় বলত, টেররিস্ট নয়। বুরহানকে এত তৎপর করে তোলার বা জমি তৈরি করার দায়টা কে নেবে? রাষ্ট্রের জমি তৈরির নজির তো কম নয়। ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, বিহারের প্রত্যন্ত হতদরিদ্র নিপীড়িত অবহেলিত অঞ্চল থেকে উঠে আসে মাওবাদী আন্দোলনের সমর্থন। তার দায় কার? রাষ্ট্র এইসব দায় স্বীকার না করলেও রাষ্ট্র বুরহান ও তার কার্যকলাপকে ভয় পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ভয় পেলেই কি কাউকে খুন করার অধিকার জন্মায়? কোনো আইন এরকম খুনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়? সকলেরই প্রশ্ন—বুরহানকে বন্দি করা হল না কেন? সকলেরই ভয় নিরাপত্তাহীনতার। রাষ্ট্রের সদিচ্ছার ওপর ভরসা নির্মূল। এখন সকলের প্রতিবাদ রাষ্ট্রের গা জোয়ারির বিরুদ্ধে। দেওয়ালে-পিঠ-ঠেকে-যাওয়া মরিয়া প্রতিবাদ। কিন্তু রাষ্ট্র তো অসীম শক্তিধর। শক্তির বিচ্ছুরণ চলছে পেলেটগানে। সেই 2010 থেকে, নির্বিচারে। আপতত কাশ্মীর তছনছ। তবে রাষ্ট্র একটা হত্যার এতটা তীব্র প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করতে পারেনি। এখন তাই প্যাঁচে পড়ে ঘরে বাইরে নিজের সমর্থনে বুরহানকে একটা লার্জার-দ্যান-লাইফ ভয়ংকর টেররিস্ট হিসেবে প্রতিপন্ন করে চলেছে।

কাশ্মীর কিন্তু কোনো দিনই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অধীন ছিল না। 1947-এর আগে কাশ্মীর ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীন প্রিন্সলি স্টেট, রাজার রাজত্ব। হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, জুনাগড়, মহীশূর, আলোয়ার, জয়সলমীর, কোটা ইত্যাদির মতো। অধুনা ভারত-চীন-পাকিস্তানের সীমারেখার প্রেক্ষিতে কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত স্ট্র্যাটেজিক। অতএব তিন রাষ্ট্রেরই শ্যেনদৃষ্টি এই ভূখণ্ডে। ফলাফলস্বরূপ অধুনা কাশ্মীরের 45%, 35% ও 20% ভূখণ্ড যথাক্রমে ভারত, পাকিস্তান ও চীনের অন্তর্ভুক্ত। 1947-এ যখন প্রিন্সলি স্টেটগুলিকে ভারত বা পাকিস্তান যে-কোনো দিকে যোগ দেওয়ার বা না-দেওয়ার সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তখন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং কোনো পক্ষে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তের পিছনে হেতু হয়ত বা ছিল ধর্মীয়—কাশ্মীরের রাজা হিন্দু কিন্তু প্রজাদের সংখ্যাগুরু অংশ মুসলমান, তাই দ্বিধান্বিত। অথবা সম্পদের আসক্তি—ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামিল হতে হবে, রাজত্বের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা খোয়াতে হবে ইত্যাদি প্রভৃতি। তবে কারণ যাই হোক বাস্তবে এই স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত ধোপে টেঁকেনি। স্বাধীনতা লাভের এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীর দখলের চক্রান্তে মন দিল এবং 1947-এর 22 অক্টোবর পাঁচহাজার জনজাতির মানুষসহ পাকিস্তানি

মিলিটারি জম্মু-কাশ্মীররে অনুপ্রবেশ করে, খানিক ভূখণ্ড দখল করে হত্যা-লুঠতরাজ-ধর্ষণ—অগ্নিসংযোগের ভয়াবহ নজির স্থাপন করতে করতে শ্রীনগরের দিকে এগোতে লাগল। হরি সিং মরিয়া হয়ে ভারত সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভারত রাজি হল না। 26 অক্টোবর বারামুল্লায় পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে এগারো হাজার প্রজা নিহত হবার ও মোহরা পাওয়ার স্টেশন বিধ্বস্ত হয়ে শ্রীনগর অন্ধকারে ডুবে যাবার পর আতংকিত হরি সিং ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিকভাবে পূর্ণ নতি স্বীকার করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নিজে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেন। অনুপ্রবেশকারীরা তখন শ্রীনগর থেকে মাত্র পাঁচকিলোমিটার দূরে। পরের দিন কাশ্মীরে বায়ুপথে ভারতীয় সেনা নামল। এর পরের ইতিহাস নেহেরুর জাতিসংঘে কাশ্মীর-সমস্যা পেশ, সিজ-ফায়ার, লাইন অফ কন্ট্রোল, নেহেরুর জাতিসংঘে আবেদন করার সিদ্ধান্তের তুমুল সমালোচনা, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে 1947-48 ও 1965-এ দু-দুবার যুদ্ধ ইত্যাদি নানান শব্দবন্ধে ভরা। আপাতত সে-সব কচকচি নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক। তবে উল্লেখ করা জরুরি যে 26 অক্টোবর হরি সিং ভারতে যোগ দেবার যে মুচলেখা দিয়েছিলেন সেই তথাকথিত চুক্তিতে কাশ্মীরি জনতার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো স্থান বা মান ছিল না। এই অন্যতম খামতি, যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম রাজনৈতিক হাতিয়ার, সেদিনও ছিল, আজ সত্তর বছর পরেও আছে। রাষ্ট্র এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয় নি। সুতরাং এক অর্থে কাশ্মীর পরাধীন হয়েছে 1965-এর 26 অক্টোবর! 1989 থেকেই কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনের দাদাগিরির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদের সূত্রপাত। এই প্রতিবাদ কখনও তীব্র হয়েছে, কখনও নরম। কিন্তু আগের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বুরহানের মৃত্যুর পর, গত জুলাই থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও নির্বিকার। সরকারের দাবি জনতার ভক্তি, ভয় আর ভোট। ভালবাসা নয়। তাই সরকারের তরফে জঘন্য নিষ্ঠুরতার জন্যে না আছে দ্বিধা, না কোনো লজ্জা!

বুরহানেরও হয়ে ওঠার একটা গল্প আছে। বুরহান স্বচ্ছল শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। ক্রিকেট ভালোবাসে এবং পড়াশোনায় ক্লাসে ফার্স্ট হয়। তার বাবা গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার। ক্লাস টেনের ছাত্র বুরহান তার দাদা খালিদের নতুন বাইকে চড়ে এক চক্কর ঘুরতে বেরিয়েছিল পুলওয়ামা জেলার ত্রাল অঞ্চলে, তাদের নিজেদেরই এলাকায়। বাইকের সওয়ারি তিনজন, দুই ভাই আর তাদের এক বন্ধু। পরে সেই বন্ধুর বয়ান থেকে জানা যায় যে পথে একদল ইন্ডিয়ান আর্মির সৈন্য তিনটি কিশোরকে দাঁড় করিয়ে বলে যে তাদের জন্যে সিগারেট কিনে এনে দিলে তবেই তারা ওদের পথ ছাড়বে। এই রকম ব্যবহারই ছিল ভারতীয় সেনার দস্তুর! খালিদ গিয়ে সিগারেট কিনে আনে। কিন্তু তাতেও সেনারা পথ ছাড়ে না। উপরন্তু তাদের

মারধর করতে শুরু করে। মারের চোটে খালিদ অজ্ঞান হয়ে যায়, তার নতুন বাইক ভেঙে যায়। বুরহান ও সেই বন্ধু কোনোক্রমে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে বাঁচে। পালাতে পালাতে বুরহান ওই সেনা অফিসারদের দেখে নেবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যায়। এর ছ'মাস পরেই বুরহান বাড়ি থেকে পালিয়ে হিজবুল মুজাহিদিন দলে যোগ দেয়।

এই গল্পেরও আরও কিছু ডালপালা আছে, যার উদ্ভবে বুরহান এবং শত শত বুরহানের সৃষ্টি। বুরহানের দাদা খালিদ ওয়ানি জঙ্গি ছিল না। ইকনমিক্সে এম.এ. পড়ছিল। ভাইয়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গিয়েছিল ট্রলের কামলার জঙ্গলে, সঙ্গে আরও তিন বন্ধুকে নিয়ে। দেখা হয়েওছিল বুরহানের সঙ্গে। কিন্তু খালিদ আর জীবিত ফেরেনি। ওই জঙ্গলে তার মৃত্যু হয় আর্মির সঙ্গে এনকাউন্টারে! 13 এপ্রিল 2015। সঙ্গের বন্ধুরা পুলিশ কাস্টডিতে। খালিদ-বুরহানের বাবা মুজফ্ফর ওয়ানি বলেছেন তিনি বুরহানের মৃতদেহ দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু খালিদের নয়। তাঁর বয়ানে—খালিদের অপরাধ তার ভাই জঙ্গি! খালিদের মৃত্যুর কারণ এনকাউন্টার হলেও মৃতদেহে কোনো বুলেটের ক্ষত ছিল না। মৃতদেহের মাথা থেকে পা অবধি প্রতি ইঞ্চি তিনি নিজে খতিয়ে দেখেছেন। মৃতদেহের প্রতিটি দাঁতে ক্ষত ছিল, নাক, কপাল ও খুলি ভাঙা ছিল। তাঁর মতে এটি কাস্টডিয়ান কিলিং। কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের সামনে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার উল্লেখ করলেও আদতে তা হয়নি।

এই গল্প তো শুধু বুরহানের নয়, ভারতীয় সেনারও। এ গল্প জানার পরও কি বুরহানকে শুধুমাত্র একজন নৃশংস জঙ্গি বলে মনে হয়? এর পাশাপাশি কি মনে পড়ে না ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপ্লবীদের কথা? সেই বিপ্লবীরাও তো দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের অত্যন্ত প্রিয় বড় মাপের মানুষ ছিলেন, কিন্তু বিদেশী শাসকের চোখে ছিলেন টেররিস্টই। বুরহানের ক্ষেত্রেও এই মানসিকতারই পুনরাবৃত্তি। তফাৎ শুধু এখানে পুলিশ, মিলিটারি স্বদেশি শাসকের, বিদেশির নয়। এমন রাষ্ট্র কি কখনও আপন হয়? এমন অসাম্যের, গা জোয়ারির শাসনতন্ত্রকে সম্মান করা যায়, না মেনে নেওয়া যায়? অসন্তোষ তাই ধূমায়িত হতে হতে বারবারই বিস্ফোরণ ঘটায়। দশকের পর দশক জুরে কাশ্মীর অশান্ত, কাশ্মীর উত্তাল, কাশ্মীর বেয়াড়া, কাশ্মীর বিপজ্জনক, কাশ্মীর ক্ষতবিক্ষত, কাশ্মীর রক্তাক্ত! এই পরিস্থিতিতে রোজের বাঁচাটা তাহলে কেমন? এত দমন-পীড়ন, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন, আজাদ কাশ্মীরের জন্যে লড়াই—এই সব পেরিয়েও খেটে খাওয়া আমজনতার রোজের জীবনটাকে স্থিতিশীল করার আপ্রাণ তাগিদে দীর্ঘমেয়াদি অশান্তি ক্রশম থিতিয়ে আসছিল। এই জুন মাসে বেড়াতে গেছিলাম কাশ্মীরে। যাবার আগে সেই আজাদকে ফোন—কাশ্মীরে যাওয়া যাবে? অবস্থা কেমন? আজাদের উত্তর—কাশ্মীর এখন স্বাভাবিক। দেশের অন্যান্য অংশেও যতটা অস্থিরতা কাশ্মীরেও ততটাই, তফাৎ

শুধু কাশ্মীর সদাসর্বদাই খবরের হেডলাইনে। নিশ্চিন্তে চলে এসো, নিজেরা ঘুরে বেড়াও, কোনো ট্যুর কন্ডাক্টরের সাহায্য নেবার দরকার নেই। আমি তো আছিই।

সেভাবেই গেছিলাম। শালিমারবাগের কাছে ছিলাম। রাত নটা-সাড়ে নটা অবধি ঘুরেছি, নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফিরেছি, কেনাকাটা করেছি, বাজারে দোকানদারের সঙ্গে গল্প করেছি, খুঁজে খুঁজে লোকাল কাশ্মীরি রেস্তোরাঁয় কাশ্মীরি পদ খেয়েছি। কখনও বিপদের গন্ধ পাইনি। অস্বাভাবিকতার আঁচ পাইনি। আটদিন ধরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফিরদৌস, আমাদের গাড়ির চালক ও গাইড। পহেলগাম-গুলমার্গ-দুধপথরি-সোনামার্গ-জোজিলা-জিরোপয়েন্ট-কোকরনাগ-ডাকসুম-শ্রীনগরের আনাচ-কানাচ সব হাতের তেলোর মতো চেনেন। অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী। নিজে রোজ রোজা রাখছেন, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ধরে হাজিরা দেওয়াতে ব্যত্যয় ঘটেনি কোনোদিন। শেষ একটা দিন হোমস্টে-তে ছিলাম। বাড়ির মালিক নিজেই তাঁর শখের ফোকসওয়ান ভেন্টো গাড়িতে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিলেন। পথে চেরি কিনতে চাওয়ায় বাজারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিজেই একবাক্স চেরি কিনে এনে উপহার হিসেবে আমাদের দিলেন। আর দোকানদার-ভেন্টোর মালিক-ফিরদৌস-সরকারি ট্যুরিষ্ট লজের কেয়ারটেকার—ঘোড়াওলা থেকে শুরু করে আজাদ পর্যন্ত সকলে বারবার বললেন—ফিরে গিয়ে যেন পরিচিত সকলকে বলি কাশ্মীর এখন নিরুপদ্রব, স্বাভাবিক। সবাই যেন নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় এখানে আসে। সব স্তরের মানুষের এই প্রচেষ্টার আন্তরিকতা মনকে বড় ছুঁয়ে যায় বইকি! চেরি-আপেল-আখরোট- জাফরান-পোলেন-উইলো-চিনারের দেশ থেকে ফিরেছিলাম অনেকটা স্বস্তি নিয়ে। কিন্তু পক্ষকালও কাটেনি তাদের সব যাপন, সব প্রচেষ্টা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল! আজাদের বর্ণনায় একটি বছর কুড়ির যুবক, কাজ করে ব্যাংকের এটিএমে। রাতে বাড়ি থেকে ফোন এল কখন ফিরবে জানতে চেয়ে। সে মাকে বলল রাতের খাবারের আয়োজন করতে, সে এখুনি বেরোচ্ছে। এটিএমের দরজায় চাবি দিয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ফেরেনি। এটিএমের সামনেই মিলিটারির গুলিতে পথে লুটিয়ে পড়েছে। কোনো মিছিল, প্রতিবাদ, জনসমাবেশ, প্ররোচনা ছাড়াই গুলি চলেছিল। এর বিচারও হবে না। হয়তো রিপোর্টে লেখা থাকবে এনকাউন্টার! সাতশো খুন মাফের চিচিংফাঁকি কোড! রোজই দেখা যায় পাড়ার মুখ ঘেরা হচ্ছে কাঁটাতারে। রোজ রোজ রোজ এই অ্যাট্রোসিটির ঘা খেতে খেতে সাহসের পারদ কোন তলানিতে ঠেকে? আজাদের পাড়ায় সিআরপিএফ টহল দিচ্ছিল বন্দুক উঁচিয়ে। হঠাৎই ওর প্রতিবেশি, পঁয়ষট্টি বছরের এক মহিলা দরজা খুলে দেখেন বন্দুকের নল যেন তাঁরই দিকে তাক করা! তৎক্ষণাৎ সেখানেই হার্ট ফেল করে তাঁর মৃত্যু! কত দিন বাঁচা যায় এভাবে? এই ভাবে বাঁচতে বাঁচতে আর কত দিন নিজেকে ভারতীয় মনে করে ধন্য হওয়া যায়?

আজাদের যৌবনকালে চারপাশ থেকে আজাদ কাশ্মীরের আন্দোলনে বা আরও কট্টরপন্থী নৃশংস টেররিজমে যোগ দেবার যথেষ্ট হাতছানি ও উপকরণ ছিল। তার অনেক বন্ধুই বর্তমানে সেই সব পথের পথিক। কিন্তু আজাদ মনে করেছেন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উত্তরসূরী হিসেবে তিনি যেটুকু শিখেছেন তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে তুলে দিতে তিনি দায়বদ্ধ। কাশ্মীরকে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সামিল করে তোলা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। যে-কোনো জঙ্গিগোষ্ঠির বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়েও আজাদ নিজেকে ভারতীয় বলেই পরিচয় দেবেন। কাশ্মীরে এরকম আজাদ তো একটা নেই। আজাদ আক্ষেপ করে বলছিলেন—স্কুল বন্ধ হয়ে বাড়িতে আটকে থাকা এই শিশু-কিশোর প্রজন্ম যখন বাবা-মার কাছে জানতে চায় যে ভারতের অন্যান্য অংশের বাচ্চাদের থেকে তারা কেন এরকম আলাদা—তখন উত্তর দিতে বড় ধর্ম সংকট হচ্ছে। ইতিহাস-বাস্তব বনাম সন্তানস্নেহ! কারফু গুলিগোলা শুধু জনজীবনকে নয়, ব্যক্তিগত যাপনের নিভৃতিকেও হতাশার অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে!

রাষ্ট্র যতদিন নতুন ফতোয়া না দেবে ফোনের যোগাযোগ আবারও হবে। আমার তরফে কী বলব আজাদকে? বিশ্বাস হারিও না আজাদ, তুমি আমারই মতো ভারতীয়? খেয়াল রেখো, তোমার ছেলেরাও যেন তোমারই মতো দায়িত্বশীল ভারতীয় নাগরিক হয়ে ওঠে? কিন্তু বলব কোন অধিকারে, কোন বিবেচনায়...??

মীনা দাঁ

47তম বর্ষের সমতট : সালতামামি
(সমতট : 185, 186, 187 ও 188)

মনোজ রায়

বহুবৃত্তিক ত্রৈমাসিক সমতট সাতচল্লিশ বছর পার করে আটচল্লিশতম বছরে পা রাখল। গত 47তম বছরে যে চারটি সংখ্যা (185-188) প্রকাশিত হয়েছে, তাতে উল্লেখযোগ্য বা ততো উল্লেখ্য নয় বা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর রচনার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই বৎসর পরিক্রমা—সালতামামি।

185 সংখ্যাটি, আমার মতে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। এর প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ (পাঁচটি), গল্প (সাতটি), রিপোর্টাজ এবং পুস্তক সমালোচনা মননশীল পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। দেবনারায়ণ ইন্দুর সম্পাদকীয় আমাদের যুক্তিহীন গতানুগতিক চিন্তাকে আঘাত করে। তাঁর শেষ কথা—'সব মিলিয়ে আমরা এক অদ্ভুত অযৌক্তিক পরিবেশে আছি'— সে কথা কি আজ আমরা অস্বীকার করতে পারি?

প্রবন্ধ : বাসব চৌধুরী'র 'শিক্ষক দিবসে শিক্ষক সমীপে' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এবং মূল্যবান মতামত ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের সঙ্গে এক কাল্পনিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। সেখানে তিনি যথার্থই বলেছেন, 'বইয়ের সম্পদকে মস্তিষ্কের ভান্ডারে জমিয়ে গেলেই বিজ্ঞতা হয় না। সেই সম্পদ থেকে যদি বোধের অঙ্কুর জন্মায়, দৃষ্টির প্রসার ঘটে, তবেই সেটা সার্থক জ্ঞান হবে।'

অম্লান দত্ত 'আরতি সেন : ফিরে দেখা' নিবন্ধে প্রয়াতা আরতি সেন সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেছেন। আরেকটি স্মৃতিচারণ একটু আশ্চর্যজনক এবং চমকপ্রদ। কল্যাণকুমার দাশগুপ্তর কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত স্বাদু ভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন এবং শান্তিনিকেতনের ঘনিষ্ঠ স্মৃতিকথা পড়তেই অভ্যস্ত—এই সংখ্যায় তিনি লিখেছেন 'সরকারি পরিচালিত শিল্পের আর্থিক সাফল্যের ক্ষেত্রে মানুষের আস্থার অভাবের বিষয়ে কিছু কথা।' শিরোনাম একটু বড়, কিন্তু দুর্গাপুর কেমিক্যালসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সরকারি রুগ্ন শিল্পের ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে প্রতি পদক্ষেপে বাধার প্রাচীর টপকানোর অজানা নির্মম ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আমার মতে, এই সংখ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সুব্রত নিয়োগীর 'গার্সিয়া মার্কেজের কথাশিল্প'। পরাবাস্তবতা জাদুকর মার্কেজের কয়েকটি নামকরা রচনার (নো ওয়ান রাইটস টু কর্নেল, ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিচ্যুড্, মেমোরিজ অফ মাই মেলাংকলি হোরস প্রভৃতি) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে গ্র্যাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাবার চেষ্টা করেছেন। সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আগ্রহ উদ্দীপক।

অরুণকুমার চক্রবর্তীর 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ : ভারতীয় শিল্পে প্রগতি ও আধুনিকতা' প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে এক বিরাট চিত্র আন্দোলনের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিংকর তো আছেনই—পরবর্তী শিল্পীরা চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়, যামিনী রায় এবং এখনও কাজ করে চলেছেন যাঁরা—সুব্রহ্মণ্যম (মানিদা সদ্য প্রয়াত), শঙ্খ চৌধুরী, রবীন মন্ডল, ইলা মেনন, বিজন চৌধুরী, বিকাশ ভট্টাচার্য, গুলাম শেখ, প্রকাশ কর্মকার, শানু লাহিড়ী, গণেশ পাইন প্রমুখের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিশদ আলোচনা নেই। আশা আছে, ভবিষ্যতে এঁদের নিয়ে আরো আলোচনা আমরা পাব।

গল্প : প্রথমেই উল্লেখ করব সমীরণ দাসের 'হায়না' গল্পের। নিরীহ মধ্যবিত্ত সংসারে একটি হায়না ঢুকে পড়েছে। সমীরণ স্বভাবসিদ্ধ মুন্সিয়ানায় সেই সংঘাত চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পে। সলিল চট্টোপাধ্যায়, তাঁর প্রত্যাশিত আঙ্গিক সরিয়ে রেখে, 'ভাল-বাসা' গল্পে সম্পর্কের টানাপোড়েনের এক বিচিত্র আখ্যান শুনিয়েছেন। সোহিনী ঘোষের 'সূর্যমুখী' হাসপাতাল, ডাক্তার, সিসটার ছাড়িয়ে তুলির সূর্য ধরার চেষ্টা কি শেষে সফল হল? কুন্তলা দত্তের গল্প 'রাজকার্যের চেয়ে বড়' খুব একটা মারপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সোজাসাপটা অঞ্জনের রাজকার্জের কথা বলেছেন। সোহিনী ঘোষ এবং কুন্তলা দত্তের গল্প দু'টো পড়তে ভালই লাগে। সুগত চৌধুরীও প্রায় অনুগল্পে 'ছেঁড়া চিঠি' শেষ অবধি একটা বেদনার আবহ তৈরি করে। 'নবজন্ম' গল্পে অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভোগ-সর্বস্ব সমাজের অবধারিত অবসাদের প্রতিষেধক আছে প্রাণের, সে যত ছোট তুচ্ছ প্রাণই হোক, উজ্জীবনে, অন্তঃসারশূন্যতার বিপরীতে প্রাণের পরিপূর্ণতায়। শেষ গল্পে উপেন পাত্র রূপকথার আদলে 'আজব দেশে আলসে'র অভিজ্ঞতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লোভী নির্মম বাস্তবতার অন্তরালে বয়ে চলেছে এক সহজ সরল জীবনের স্রোত—প্রকৃতির স্পর্শধন্য মানব সমাজ। কিন্তু শেষ উপলব্ধি—'আকাঙ্ক্ষাই জগতে সমস্ত দুঃখের কারণ'—একটু বেশি রকম পশ্চাদমুখী মনে হয় না? ব্যাপক অর্থে আকাঙ্ক্ষা কিন্তু সভ্যতার অন্যতম নিয়ামক।

কবিতা : এই সংখ্যায় তিন কবির তিনটি কবিতা আছে—আর্ট অফ লিভিং—সুজাতা পাল; অসিতকুমার দে'রতিনটি নদীবিষয়ক, ও গীতবিতান, এবং হোলি। কালিশংকর বাগচীর—রজক, তোমাকে। এবং শেলি চট্টোপাধ্যায়ের—এমন একটি নদী, অন্ধ, ফাঁকি, হাওয়া, দেবতা। শেষের চারটি খুবই ছোট কবিতা।

186 সংখ্যা : সম্পাদকীয় মন্তব্যে মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা পরীক্ষায় পাশ-ফেলের যৌক্তিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। সামাজিক পশ্চাৎপদ শ্রেণি থেকে যারা আজ শিক্ষাঙ্গনে আসছে, তাদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, যাদের পরিবেশে 'ফর্মাল' শিক্ষার পটভূমি নেই, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিলে, অথবা ফিরিয়ে আনলে কি শিক্ষায় ড্রপ-আউটের সংখ্যা কমানো যাবে? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন না এনে কি শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে?

এই সব প্রশ্নের, ঠিক উত্তর না হলেও, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন সূর্যাংশু ভট্টাচার্য তাঁর 'শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে শ্রেণিহীন স্বাধীন-সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ নেতাদের শিক্ষানীতি আর স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমান কালে অনুসৃত শিক্ষানীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। 'সবার জন্য সমান শিক্ষা'—বাক্যবন্ধ হিসাবে টিঁকে আছে কিন্তু নীতি হিসাবে গোল্লায় গেছে। সরকারি স্কুলে পড়তে মাইনে লাগে না, বেসরকারি (অর্থাৎ ব্যবসায়িক) স্কুলে ভর্তি হতে গড়পড়তা আশি হাজার, মাস মাইনে চারহাজার। মজার কথা, সেই সরকারই আবার শিক্ষার মান বাড়াবার জন্য শিক্ষায় বে-সরকারিকরণে উৎসাহ দিচ্ছে। শ্রী ভট্টাচার্য নানান সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়ে এই বৈষম্যের উদাহরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তবে একটা কথা, প্রবন্ধটির বাক্যগঠন মাঝে মাঝে শিথিল এবং অন্বয়হীন হওয়ায় বুঝতে অসুবিধা হয়।

প্রয়াত সমীর চক্রবর্তীর 'করম ব্রতকথা' অস্ট্রিক, প্রোটো, অস্ট্রালয়েড, এমন কি মঙ্গোলয়েড টোটো জনজাতি সমাজের এই ব্যাপক উৎসবটির পরিচয়, পুরাকথা এবং সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যেসব সংখ্যায় টুপুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ থাকে, আমি খুঁটিয়ে পড়ি। এবং পড়ে অবাক হই। বাঙালির আটপৌরে থেকে রাজকীয় খাদ্যের মধ্যে যে এত রস, এত ইতিহাস লুকিয়ে আছে, কে জানত! আমার ধারণা ছিল রসনাই শেষ কথা—ইতিহাসে রস নাই। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক গবেষণায় ষোড়শোপচারে সাজানো এই লেখাগুলো আমার মতো আরও অনেকের ভুল নিশ্চয়ই ভেঙেছে। এবারে

প্রসঙ্গ 'তিক্তকথা'। প্রথমপাতে তেতো—নিমবেগুন, উচ্ছে ভাজা, পলতার বড়া (এখন দুর্লভ)—আমার ভাল লাগে। যদিও অনেকের কাছে তা সাংঘাতিক। চর্যাপদের 'খায় গুণবন্তা' থেকে বিপ্রদাস, প্রজ্ঞাসুন্দরী, লীলা মজুমদার—সবার রেসিপি মন দিয়ে পড়ি—খেতে পাই না। তার কারণ আমার বয়স, অনেক উপাদান অজানা এবং সাধ্যের বাইরে, এবং সে সব রান্নার লোকই বা কোথায়? একমাত্র ভরসা গবেষণালব্ধ খাদ্য নাম, খাদ্য তালিকা আর গবেষকের মনোরম পরিবেশনা। ভবিষ্যতে এরকম লেখা আরও আশা করছি।

রেনুকা মাজীর 'মেঘনাদবধ কাব্য : মধুসূদনের স্বাদেশিকতা' পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। একটু যেন গতানুগতিক বেশি পাণ্ডিতি লেখা। ছাত্র পাঠ্য ক্লাশ নোটের মতো। কারো কারোর বিশেষ উপকার হবে এই প্রবন্ধে।

প্রবীর রায়ের প্রবন্ধ 'দলীয় গোলক ধাঁধার আবর্তে' প্রথমেই বিতর্কমূলক বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। উনি তো সত্যকথাই স্পষ্ট করে বলেছেন। তাতেই 'আরগুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান'দের সব বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। তবে অন্যমত সর্বদাই স্বাগত—বিতর্ক চলুক। কিন্তু এখনও কেউ এগিয়ে আসেনি। এতে কী প্রমাণ হয়? তর্কে বহুদূর, না সাহসের অভাব?

আলোক চট্টোপাধ্যায়ের 'সমস্যাটা অভ্যন্তরীণ, প্রশ্নটা মানবাধিকারের প্রবন্ধটি শিরোনামের মতোই জটিল, বিতর্কমূলক এবং প্রাণিধানযোগ্য। আসল কথা, মনে হয়, ভারতের জনসংখ্যায় হিন্দুর অনুপাত কমছে, মুসলমানদের বাড়ছে এবং এই অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা আসলে কট্টরবাদী ভণ্ডামি। যাই হোক, প্রবন্ধের দু'একটা শব্দ চোখে লাগল— ভ্রিনদানওয়াল, Numismatic! আগামী শতাব্দী (3000) ইত্যাদি।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্তকে আবার ফিরে পেলাম তাঁর স্ব-রূপে, শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণায়। 'আমাদের সতীদা' পরিচয় করিয়ে দিল এক স্বল্প পরিচিত গবেষকের সঙ্গে—যাঁর পুরো নাম নচিকেতা সেন।

এই সংখ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হতে পারত অর্ঘ্যকুসুম দত্তের 'আমাকে কে নিয়া যাবে কেনিয়া।' কিন্তু তা হল না। হয় আলসেমি। অথবা তার ভূমিকা—মাত্র দু-পৃষ্ঠা! তার মধ্যেই কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ আছে—আছে প্রচ্ছদ মলাটে চারটে ছবি। তাতে অবশ্য পাঠকের 'ভরিল না চিত্ত'।

দেবকুমার সাহার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির নাম 'কবি ভাস্কর চক্রবর্তী : কবিতার শৈলীবিচার'। তত্ত্বকথা আছে, কাব্য বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু লেখার নৈপুণ্যে, কখনই ভারাক্রান্ত মনে হয়

না—অকালপ্রয়াত কবি যেন চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠেন। এবং প্রসঙ্গ আলোচনায় দেবকুমার আধুনিক কবিতার রসগ্রহণের মূল সূত্রটি আমাদের চিনিয়ে দেন। কবিতা পাঠক হিসাবে এটা আমাদের বড় লাভ।

গল্প মাত্র একটি—মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেতোর মা।' সপরিবার মা-দুর্গার আধুনিক সংস্করণ। নেশাখোর মিনসে সমেত দুই মেয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে বস্তিতে থাকে। পাড়ার অসুর (মস্তান) দলন করার দায় তার একার—কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসে না। একেবারে বেচারি মা দুর্গার অবস্থা।

পরিশেষে ক্রোড়পত্র হিসাবে রয়েছে একটি থ্রিলার। অমিতানন্দ দাশের 'তক্ষশীলার গুপ্তধন'। কাহিনী চিরাচরিত গতানুগতিক—গুড গাই ও ব্যাড গাই—ষড়যন্ত্র, মাফিয়াগোষ্ঠির পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ চুরির প্রচেষ্টা। সেটা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যর্থ করা ইত্যাদি। তবে লেখক পড়াশোনা করে খেটে খুটে ইতিহাস আর পশ্চিম চীন ও উত্তর ভারতের সীমান্তের ভূগোল মিলিয়েছেন নিপুণভাবে। সেটা কম মূল্যবান নয়।

187 সংখ্যা : এই সংখ্যাটির চেহারা একটু কৃশ হলেও, আমার বিবেচনায় বেশ ভারি বিষয়বস্তুর গুরুত্বে।

একটি মাত্র গল্প—সায়ন্তনী ভট্টাচার্যের 'পিঁপড়ে'। বিপদ আসন্ন হলে পিঁপড়েরা পুরনো বাসা ছেড়ে নতুন বাসার খোঁজে লাইন করে বেরিয়ে পড়ে। কিছু বিপন্ন মানুষও ভালবাসা এবং ভালো বাসার খোঁজে উদ্‌ভ্রান্ত। পুফ আর পিমের (লাল ডেঁয়ো পিঁপড়ে) নেতৃত্বে পিঁপড়ের দল কীভাবে সেই সব মুমূর্ষুভীত মানুষদের সুখের সন্ধান দিল, সেই কাহিনী, বিভিন্ন চরিত্র ও ছোট ছোট ঘটনা কোলাজ, বুদ্ধিদীপ্ত ঝরঝরে ভাষায় বলেছেন—রূপকথার মতো বাস্তব-অবাস্তব মিলেমিশে একাকার।

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সব লেখাই সব সময়েই স্বাদু। এই রম্যরচনা 'গুরগাঁও প্রবাসীর পত্র' (যা ইতিমধ্যে গুরুগ্রাম হয়ে গিয়েছে) অতি মনোরম। নাস্তিক বাঙালি রমনীর হতভম্ব দ্বিধান্বিত বিশ্বায়ন—অন্তত ভারতায়ন। বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলা—তাঁরা বই পড়াকে টাইম পাসের ছুতো মনে করেন, নিজেদের হাতে রাতের রোটি পাকায়, অশ্রুতপূর্ব আমলা গাছে পুজো করেন, কার্তিক মাসে ভাণ্ডারার আয়োজন করেন, অর্থাৎ কাঙালি ভোজন করান। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্য তেমন জুতসই কাঙালি গুরু দ্রোনাচার্যের মেট্রোপলিসে পাওয়া গেল না। 'পুনশ্চঃ পুরনো খবরের কাগজের ব্যবহার হচ্ছে ন্যাপকিন হিসাবে....। সদস্যরা যখন প্রসাদ খাবেন তখন কাগজ তাঁদের কোলের উপর পাতা থাকবে।' লেখিকার শেষ মন্তব্যে মনে পড়ল বম্বে এয়ার পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জের টয়লেটে টিসুর পরিবর্তে দেখেছিলাম খবরের কাগজ।

চারটি প্রবন্ধ। প্রথমে উল্লেখনীয় যে প্রবন্ধটি—ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের 'পূর্ব কলকাতার জলা এলাকা ও পরিবেশ ভারসাম্য'—সেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সমতট 81 সংখ্যায়। যদিও বহুদিন পূর্বে লিখিত কিন্তু আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি—বরং বেড়েছে বলা যায়।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বুজিয়ে সল্টলেক নগরী গড়ে উঠেছে—এতে কলকাতার বাজারে সবজি আমদানি কমেছে। ভেড়ি অঞ্চল হ্রাস পাওয়ায় এবং বিদ্যাধরী নদী অবহেলায় মজে যাওয়ার মাছের চাষ কমেছে—সর্বোপরি হাজার হাজার পরিবার উৎখাত হয়ে প্রথমে ভিখিরি তারপর উহ্য হয়ে গেছে। এখন নগরায়ন হচ্ছে রাজারহাট—নিউটাউন নামে। শ্রী ঘোষের পরিসংখ্যান ভিত্তিক বিশ্লেষণে রাজারহাট নেই, কিন্তু তার impact কি কলকাতার শরীর স্বাস্থ্যের ওপর পড়ছে না? পড়লে কতটা? তার সদুত্তর খুঁজতে এই প্রবন্ধ প্রভূত সাহায্য করবে।

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্শন ও বিজ্ঞানের যৌথ উদ্যোগ' মৌলিক রচনা না হলেও, প্রাচীনকাল থেকে নিউটন অবধি, কিছু কিছু বিজ্ঞানীর অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস পড়তে ভালই লাগে। ইংরেজি-নির্ভর বইয়ের সাহায্য নিয়ে লেখা বলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বাদ পড়ে গেছেন। চরক-সুশ্রুত-আর্যভট্ট—ভাস্করাচার্যের উল্লেখ থাকলে ভাল হত। ভাষা বানান সম্পর্কে লেখকের আরও একটু যত্নবান হওয়া উচিত। আজো, কিম্বা, নিউক্লিয়ার্স, জীববিদ্যা—Biology—Zoology-কে বলে প্রাণীবিদ্যা—বিজ্ঞানবিষয়ক লেখায় সামান্য ত্রুটিও লেখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে পারে। তবে বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় যে কোন সুপাঠ্য লেখাই স্বাগত।

'প্রসাদ' সম্পর্কে মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহার নিবন্ধ না পড়লে জানতেই পারতাম না---প্রসাদ নিয়ে এতকিছু বলার আছে। শুধু লৌকিক সংস্কৃতি নয়—সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক আলোচনাও এই প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছে।

শুভ্রজিৎ রায়ের 'সময়হীন যন্ত্রসভ্যতা ও আমরা' প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট যে ঠিক কী বোঝা গেল না। একটু এলোমেলো দার্শনিকতার ফসল বলে মনে হল। তবে সবার তা মনে না-ও হতে পারে।

প্রণব দত্তের 'বাঙালির আড্ডা' স্মৃতিচারণমূলক লেখা। বেশ উপভোগ্য।

কৈশোরে যখন থেকে সাহিত্যে কৌতুহল জেগে উঠছিল, তখন থেকেই 'একক' কবিতা পত্রিকার নাম শুনছি। ওই অঞ্চলেই বসবাস ছিল বলে বহুবার শুদ্ধসত্ত্ব বসুর বাড়িতে গিয়েছি। তারপর কবিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলেও কবিতায় আগ্রহ কমে আসায়

'একক'-এর অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম—সন্তোষ চন্দ মনে করিয়ে দিলেন, পত্রিকাটি আজও বিরতিহীনভাবে 75 বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বাংলায় ছাপা বইয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। সেটিও মূল্যবান।

মৈত্রেয়ী দেবীর শতবর্ষে পিনাকী ভাদুড়ী তাঁর বিখ্যাত এবং কিছুটা বিতর্কিত বই 'ন হন্যতে' নিয়ে আলোচনা করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবী যেমন অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন ভাষায় বিদেশী ছাত্র মির্চার সঙ্গে প্রেমের কাহিনী লিখেছেন, সমালোচক পিনাকী ভাদুড়ীও কোন রাখঢাক না রেখেই পিতা দার্শনিক সুরেন দাশগুপ্ত, মাতার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়, রবীন্দ্রনাথ এবং লেখিকার স্বামী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং বিতর্কিত উপন্যাসটি সম্পর্কেও বিতর্ক উসকে দিয়েছেন।

188 সংখ্যা : রাজার ধর্ম রাজধর্ম পালন—তাতে সামান্য ত্রুটি থাকলেও রাজ্যের ক্ষতি হয় বিরাট—রাজা হয় খান খান, ধর্মও নাশ হয়। এই সংখ্যায় মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় পড়তে পড়তে মনে পড়ল—2002 সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে 'রাজধর্ম' পালনের কথা স্মরণ করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, শুনেছিলেন কি না সেই ইতিহাস আলাদা। রাজধর্মের সংজ্ঞা পরিস্থিতি ভেদে আলাদা আলাদা হয়—তাই সেই মুখ্যমন্ত্রীই আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

এরপর প্রবন্ধের কথায় প্রথমে আসা যাক। এই সংখ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা জাহিরুল হাসানের 'মুসলিম নারী—দেশে দেশে, যুগে যুগে'। সাধারণত অ-মুসলিম মানসে একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে—কোরান-হাদিসে মুসলিম নারীকে এমন কঠিন নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে যে তার পক্ষে শিক্ষায়, সংস্কৃতিচর্চায়, সামাজিক দায়িত্বপালনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। লেখক হজরত মোহাম্মদের সময় থেকে আরম্ভ করে বিশাল মুসলিম জগতের ইতিহাসে সফল নারীদের অবস্থান বিচার করে সেই ভুল ধারণা শোধরাবার প্রয়াস করেছেন। যে সব ক্ষেত্র, স্পষ্টতই পুরুষদের—যুদ্ধপরিচালনা, রাজ্যশাসন, ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা—সেই সবক্ষেত্রেই মুসলিম নারীর অবদান অনস্বীকার্য। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মিশর, তুরস্ক, ইরানের প্রগতি আন্দোলন কেন, কীভাবে কট্টরবাদী প্রতিক্রিয়ায় ফের হিজাবে-বোরখায় মুখ ঢাকতে চাইছে—লেখক ইংগিত করেছেন, প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে বিশদ আলোচনা করতে পারেননি। আমাদের মন্দভাগ্য। পরবর্তী লেখায় এই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, আশা করি।

কুম্ভমেলা, বিশেষ করে প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভমেলা সম্বন্ধে বহু লেখক বহু বিবরণ দিয়েছেন। কেউ ভক্তিতে, কেউ বিস্ময়ে, কেউ বা সহাস্য সরসভঙ্গীতে লিখেছেন—কিন্তু

কেউই লক্ষ কোটি মানুষের জমাট অথচ চলমান ভক্তির ক্ষেত্রে নিরাসক্ত থাকতে পারেনি। কৌশিকব্রত দে'র বিবরণী 'মহাকুম্ভের অমৃত—2013' সেই ইতিহাসে নবতম সংযোজন। বহু প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স এতে আছে যা অনুসন্ধানী উৎসাহী পাঠকের কাজে লাগবে।

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়ের 'সরকারি দপ্তরে চালু হিসাব-ব্যবস্থার পরিবর্তন' একেবারে ভিন্ন মেরুর একটি কঠোর বাস্তব প্রস্তাব। কৌশিকবাবু অমৃতকুম্ভের পারলৌকিক আবেগের হিসাব দিয়েছেন, অতনুশাসনবাবু সেই কুম্ভের প্রতিটি বিন্দু অমৃতের সরকারি দপ্তরে Balance Sheet তৈরির double entry accrual system of accounting-এর অন্দর মহলে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। আবার কেউ আক্ষরিক অর্থে নেবেন না—তবে সরকার জনগণের মহার্ঘ রাজস্বের আয়-ব্যয়ের যেভাবে হিসাব রাখে তাতে অমৃতের অপচয় রোধের উপায় বাতলেছেন লেখক। সেদিক থেকে প্রবন্ধটা আবশ্যই ব্যতিক্রমী।

অনেকদিন আগেই সম্পাদকের দীর্ঘজীবনের বিচিত্র এবং সংগ্রামশীল অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করা উচিত ছিল—অর্ঘ্য দত্ত সেই কাজ 'আনপড়ের ডায়েরি'তে শুরু করেছেন। আগেও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লিখেছেন—কিন্তু এবার যেন একটু আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু উদাসী লোককে কিছু বিশ্বাস নেই—কতদিন এই উৎসাহ থাকে দেখা যাক। আমরা আরও পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। একটা প্রশ্ন—'আনপড়' বাংলা কথা নয়, এর মানে কি 'অশিক্ষিত' না 'নিরক্ষর'? দু'টোর অর্থ কিন্তু একটু আলাদা।

এই আলোচনায় কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা' রচনার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এ সম্পর্কে বহুজনের বহু জিজ্ঞাসা আছে—অনেকে অনেক রকমভাবে প্রথম দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে দ্বিধান্বিত আলোচনাও করেছেন। শেষের দিকে নিবেদিতার সংশয়াকুল আচরণও অনেকের দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রী দাশগুপ্তও মনে হয় শেষ অবধি সেই সংশয় থেকে মুক্তি পাননি। প্রশ্ন দিয়েই তিনিও শেষ করেছেন।

'চিঠিপত্র' বিভাগে তো দু'টি চিঠিই উল্লেখযোগ্য। পিনাকী ভাদুড়ী প্রতিবছর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে কৃতিছাত্রদের নিয়ে গণ মাধ্যমে যে ঢক্কানিনাদ হয়—শেষ অবধি তার ফল কী দাঁড়ায়—এই নিয়ে সংগত প্রশ্ন তুলে বলেছেন—'এদের সবাইকে আমরা বাঙালি হিসেবে পেয়েছিলাম, মানুষ হিসাবে পেয়েছি কি? এরা তো প্রাণপনে অবাঙালি হয়ে ওঠার চেষ্টায় রত', ভাবনার কথা বৈকি!

শ্রী শীতাংশু চক্রবর্তীর 'সমগ্র' নামক প্রবন্ধের মুকুল ঘোষালের আলোচনার প্রতিবাদের শ্রীমতী অনুপূর্বা দেবী যে চিঠি 182 সংখ্যায় যা লিখেছিলেন—মুকুলবাবু অতি সংযত ভাষায় তার উত্তর দিয়েছেন।

'শীতাংশু বাবু ও অনুপূর্বা দেবী ভারতীয় সমাজের মানসিক জড়তা এবং পরিবর্তন-বিমুখতাকে আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতার ফলে স্থায়িত্ব বলে মনে করেন।' এই বিচিত্র দাবির আরও বিশদ প্রতিবাদ মুকুলবাবুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল। সেটা অপূর্ণই রয়ে গেল।

সবশেষে 'অনুবাদকের দায় ও দায়িত্ব নামে অভিজিৎ মুখার্জির সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন আছে। অভিজিৎবাবু অল্প বলেন, কিন্তু যা বলেন, তাতে মনোযোগ দিতেই হয়। সাক্ষাৎকারও তার ব্যতিক্রম নয়।

ছোটগল্পে অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তগোলাপ'-এ একটু ভিন্ন আঙ্গিকে দুই চরিত্র—মাধবী এবং সুজয়ের কথা—রাজনীতির পৃথক লেভেল থেকে মানুষের সম্পর্কের গূঢ় ঐক্য বিচার করা হয়েছে। তবে তা সংক্ষিপ্তির কারণে প্রশ্ন সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরো উত্তর অলভ্যই থেকে যায়। হয়তো লেখিকার সেটাই উদ্দিষ্ট।

দুটি কবিতা—মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার জীবন দেবতার উদ্দেশে' এবং সৌভিক দত্তের 'পঁচিশে বৈশাখ' সম্বন্ধে বিচার করার দক্ষতা আমার নেই। তবে পাঠক হিসাবে পড়তে মন্দ লাগল না।

ভারতের আমজনতার জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি

ড. রবীন মজুমদার

ড. রবীন মজুমদার একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও বিজ্ঞানী। উনি ছিলেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের একজন ছাত্রপ্রিয় প্রথিতযশা অধ্যাপক। ফলিত রসায়নে ওনার গবেষণা বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত।

তাঁর বাইরেও ওনার একটা খুব বড় পরিচয় আছে। উনি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী এবং 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সম্পাদক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে উনি দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ওপর ওনার নানা লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'চর্চাপদ' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ওনার বই 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' প্রফুল্লচন্দ্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক অন্যধারার লেখা।

রবীনবাবুর বর্তমান লেখাটি হল 2015 সালে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সোশ্যাল সায়েন্স কংগ্রেসে দেওয়া ওনার বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ। মূল ভাষণটি ছিল ইংরিজিতে। আমার লেখাটি পড়ামাত্র মনে হয় সমতটের পাঠক/পাঠিকাদের জন্য এটির অনুবাদ করা দরকার। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আম আদমীর কাছে বিজ্ঞানের সুফল কোথায়, কতটুকু পৌঁছেছে, বা আদৌ পৌঁছেছে কিনা সেই প্রশ্ন তোলার সংগে সংগে একেবারে মৌলিক নিজস্ব কিছু সমাধানের রাস্তাও বাতলেছেন। সেই রাস্তাগুলো মানা বা না মানা পাঠকের নিজস্ব বিষয়; আমি নিজেও কয়েকটি জায়গায় ওনার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই ওনার কথাগুলো সমতটে থাকা মানুষদের ভাবাবে। আলোচনা হবে, তর্ক হবে কিন্তু ফেলে দিতে পারা যাবে না। ওনার ফুরফুরে নির্ভার ইংরিজির কতটুকু বাংলায় তুলে ধরতে পেরেছি জানিনা কিন্তু এই লেখাটিকে কেন্দ্র করে সমতটের পরের সংখ্যাগুলোয় জোর তর্কাতর্কির প্রত্যাশায় রইলাম।

—অনিন্দ্য রুদ্র (অনুবাদক)

।। এক ।। ভারতে বিজ্ঞানচর্চা কি সাধারণ মানুষের জীবনমান বাড়িয়েছে?

এটা প্রায় একটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যাওয়া ধারণা যে বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ায়। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এই কথাটা ততোটা সত্যি নয়। বিশেষত সেই সব গরীব ও প্রান্তিক মানুষদের ক্ষেত্রে যাদের জন্য এর দরকার সবচেয়ে বেশি। তারা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উপকারিতা তো পায়ই না উল্টে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর উন্নয়নের ফলে নানারকম অসুবিধা ও দুর্ভোগের মধ্যেই পড়ে।

এই জিনিসটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। আবার অজস্র গবেষণা ও তথ্যও এই কথাটাকেই সমর্থন জোগায়। একটার কথাই শুধু বলছি। হর্ষ মন্দরের সেন্টার ফর ইকুইটি স্টাডিজের *ইন্ডিয়া এক্সক্লুশান রির্পোট, 2013–14*-তেও এই ধারণাটারই সমর্থন পাওয়া যায়।

রিপোর্টটি বলছে সরকার জনকল্যাণের উপচারগুলিকে (Public Goods) সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া অংশের কাছে যথেষ্ট-ও-যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। জনকল্যাণ-উপচার বলতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি মৌল চাহিদা যেমন স্কুল শিক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ, ভালো কাজের সুযোগ, পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যবস্থা, আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার কথা বোঝানো হচ্ছে। যারা এগুলোর সবচেয়ে কম সুযোগ পেয়েছে তারা হল আদিবাসী, মহিলা, মুসলিম এবং প্রতিবন্ধীরা। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব শিশু ন্যূনতম লেখাপড়াটুকুও শেখার সুযোগ পায় না। এই বাচ্চাগুলোর অনেকেই স্কুল স্তরেই জাতপাতেরও শিকার হয়। শুধু যে মৌলিক সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলো থেকেই এই মানুষগুলো বঞ্চিত হয়েছে তা নয়, অনেক সময়ই তারা তাদের জীবনের যে পরিবেশ-ভিত্তি সেখান থেকেও উৎখাত হয়ে যায়, নয়তো একটা জঘন্য নোংরা পরিবেশ, যা তাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোভাবেই খাপ খায় না, সেখানেই থাকতে তারা বাধ্য হয়।

এই ব্যর্থতার গল্প, এই পিছিয়ে যাওয়ার কাহিনী দেশের সম্পদকে মানুষের জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর দায়িত্বের কথা মনে করায়। একটা দুষ্টচক্র যেন কাজ করছে। সরকার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রশাসন নিয়ে মাথা ঘামায়। বিজ্ঞানকে ধরেই নেওয়া হয় যে তা রাষ্ট্রের কর্মসূচিগুলিকে রূপায়ণ করবে। অথচ সাধারণ গরীব মানুষ বিজ্ঞানের সুফলকে যেন ছুঁতেই পারে না। দুধ চমৎকার খেতে এটা জানা একটা জিনিস আর অন্য লোককে সেটা খেতে দেখা যেমন আর একটা জিনিস, তেমন নিজে খেয়ে তার পুষ্টি স্বাদ গন্ধকে বোঝা সম্পূর্ণ পৃথক একটা বিষয়। বিজ্ঞানীরা তার পরেও মনে করেন যে তাঁরা দেশের মানুষদের জন্য বিরাট একটা কিছু করছেন। বিরাট একটা সেবামূলক কিছু, যা স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। যদি এই দুষ্টচক্রকে না ভাঙা যায়, আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ চূড়ান্ত অসাম্যের শিকার হবেন, বিজ্ঞানে-প্রযুক্তির উন্নয়নের সুফলের বাইরে থেকে যাবেন, অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস আর কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা বিজ্ঞানের প্রভাবে, বিজ্ঞানীর চেষ্টায় মানুষের বেঁচে থাকা আরো সুগম হওয়া, সহজ হওয়ার যে চিরকালীন স্বপ্ন তা অধরাই থেকে যাবে।

।। দুই।। এন আর আই বিজ্ঞানীদের কথা—

ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সূচক হিসাবে অনেক কিছুই ধরা যায়। যেমন কত ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান পড়ছে, তাদের মধ্যে কতজন গবেষণা করছে, কতগুলো গবেষণাপত্র প্রকাশ পেল, কতগুলো আবিষ্কারের স্বীকৃতি পেল ইত্যাদি। এটার বাইরেও জনকল্যাণের উপচারগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে কতটা পৌঁছে দেওয়া গেল সেটাও একটা বিচার্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে কিন্তু তা কখনও হচ্ছে না। আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলতে বিদেশী, বিশেষত পশ্চিমী মানুষদের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পুরস্কার আর স্বীকৃতিকেই বুঝে থাকি। এটা আশ্চর্যের নয় যে ভারতের বিজ্ঞানীদের কাজ আর স্ট্যাটাসকে মাপা হয় নোবেল প্রাইজ পাওয়া আর না পাওয়া দিয়ে।

আমরা আক্ষেপ করি যে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ আর আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসছে না। নোবেল প্রাইজ বা অন্য কোনও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া বা না পাওয়াটা আমাদের বিজ্ঞান প্রচেষ্টার আদৌ কোনও লক্ষ্য বা মাপকাঠি হওয়া উচিত কি অনুচিত সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় তর্ক, তবে সেই তর্কটা আপাতত তোলা থাক। অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীই ভারতে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে পরে কাজ করে নোবেল পেয়েছেন। হর গোবিন্দ খোরানা (1968 সালের নোবেল বিজেতা) এবং ভেঙ্কটরমণ রামাকৃষ্ণান (2009 সালের নোবেল জয়ী) যখন নোবেল পেলেন আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম এটা ভেবে যে যাক আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেলেন। কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাই যে তাঁরা তখন আর ভারতীয় নাগরিক নন এবং তাঁরা অন্যদেশের ভীষণ উন্নতমানের গবেষণাগারে অন্যরকম একটা বিজ্ঞান সংস্কৃতিতে কাজ করে তবেই প্রাইজটা পেয়েছেন। ভি. রামাকৃষ্ণান যখন নোবেল পেলেন ভারতে একটা সভায় তাঁকে ভারতের ভূমিপুত্র বলায় বিরক্ত হয়েছিলেন। আমার মনে আছে হরগোবিন্দ খোরানা কোলকাতায় একটা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন ভারতে শুধু মাত্র একটা চাকরী পেতে তাঁকে কি ভীষণ লড়াই করতে হয়েছিল এবং তাতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং বাধ্য হয়েই তাঁকে দেশ ছেড়ে আমেরিকা গিয়েই বাস করতে হয়েছিল।

ওয়াই সুব্বারাও এবং আনেসুর রহমান অবশ্য হরগোবিন্দ বা রামাকৃষ্ণানের মতো ভাগ্যবান ছিলেন না। তাঁদের নাম বেশ কয়েকবার নোবেল প্রাইজের জন্য উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রাইজটা পাননি এবং আমার মনে হয় খুব কম ভারতীয় বিজ্ঞানীই তাঁদের নাম জানেন। সুব্বারাও মেথোট্রেক্সেট (Methotrexate) বলে একটা চমৎকার কেমোথেরাপির আবিষ্কারক যা শুধুমাত্র ক্যান্সারের চিকিৎসায় কার্যকরী তাই নয়, আরও

অনেক অটোইমিউন রোগ যেমন রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, লিউপাস(Lupus), সোরাসিস (Psoriasis), ইত্যাদির চিকিৎসাতেও কার্যকরী। উনি ফলিক্ অ্যাসিডের সংশ্লেষও করেছিলেন এবং ফাইলেরিয়ার (Filariasis), একটা ওষুধও বার করেছিলেন। পেশীর নড়াচড়ায় অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (Adenosine TriPhosphate—ATP) -এর ভূমিকার আবিষ্কারও তাঁরই কৃতিত্ব। তাঁকে সম্মান জানাতে একটা ফাঙ্গাসের নামই করা হয়েছিল (*Subbaromyces splendens*)।

হায়দ্রাবাদে জন্মানো আনেসুর রহমান (1927-1987) ভারত ছেড়ে প্রথমে কেম্ব্রিজ এবং পরে আমেরিকায় চলে যান তাঁর গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। উনি কম্প্যুটারের সাহায্যে গাণিতিক পদ্ধতিকে ভৌততন্ত্রের গবেষণায় (Physical System) কাজে লাগানোর সূচনা করেছিলেন।

একটা মজার বিষয় হল ইদানিং সারা পৃথিবীতে ভারতের বিজ্ঞানীরা তথ্যের বিকৃতি এবং তথ্যের চুরির জন্য বেশ বিখ্যাত কুখ্যাত হয়েছেন।

।। তিন।। রেঁনেশা এবং ভারতের বিজ্ঞান চর্চা

যে চারজন বিজ্ঞানীর কথা বলা হল, তাঁদের মধ্যে সুব্বারাও একটু ব্যতিক্রমী ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ভারতে স্বীকৃতি পায়নি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার জন্য এবং গান্ধিকুর্তা পরার জন্য মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিটা অবধি দেওয়া হয়নি। তিনি 1922 সালে আমেরিকা যাত্রা করেন ভাগ্যের সন্ধানে। সেখানে মেডিক্যাল ডিপ্লোমা পান এবং কাজ শুরু করেন।

1920'র দশকে যখন সুব্বারাও আমেরিকায় থিতু হচ্ছেন, পূর্বভারতে তখন বিজ্ঞানের জাগরণ চলছে। তথাকথিত বাংলার নবজাগরণের অংশ হিসাবে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চতর বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হচ্ছে যা ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। জগদীশ চন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এই দুই বিজ্ঞানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি করা অজস্র বাধাকে অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার একটা পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হন। এই দুজন মিলে ভারতে বিজ্ঞানচর্চায় নবজাগরণকে একটা পূর্ণতায় নিয়ে আসেন। জগদীশচন্দ্রর প্রাথমিক আগ্রহ-ক্ষেত্র ছিল মৌলিক বিজ্ঞান এবং প্রফুল্লচন্দ্রর কাজের জায়গা ছিল ফলিত বিজ্ঞান। সেই সময়ে কোলকাতা ছিল সারা ভারত শুধু নয়, ইউরোপের মানুষেরও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সেই সময় সি.ভি.রমন, কোলকাতায় কাজ করেই নোবেল প্রাইজ পান।

সেই সময়টায় আরও অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার আকাশে দেখা দেন, যাঁরা তাঁদের অবদানের দ্বারা ভারতের বিজ্ঞানচর্চাকে প্রায় পাশ্চাত্যের সমকক্ষ করে তোলেন। অনেকেই তাঁদের মধ্যে নোবেল প্রাইজেরও দাবীদার ছিলেন। একটা পরাধীন অনুন্নত দেশের থেকে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য এতজন বিজ্ঞানী থাকতে পারেন ভেবে আশ্চর্য লাগে। ইউ. এন. ব্রহ্মচারী, জগদীশচন্দ্র বসু থেকে আরম্ভ করে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, এইচ. জে. ভাবা— কে নেই সেই তালিকায়?

।। তিন।। দুজন ভুলে যাওয়া ভারতীয় বিজ্ঞানী

কয়েকদশক আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা একটা গভীর আলোচনার বিষয় ছিল। দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর জীবন ও কাজের দিকে ফিরে তাকালে বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা বোঝা যায়।

বিজ্ঞানী ও গবেষক হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কোনোদিনই নোবেল প্রাইজের দাবীদার ছিলেন না। তাঁর কাজ, যদিও যথেষ্ট গুরুত্বের, কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ততটা উপযোগী হিসাবে গণ্য ছিল না। তিনি বরং বেশি বিখ্যাত ছিলেন ভারতে আধুনিক রসায়নচর্চার জনক হিসাবে। ভারতীয় হিসাবে আমরা অবশ্য তাঁর অন্য অবদানগুলো নিয়েও যথেষ্ট গর্বিত হতে পারতাম।

প্রথমটা হচ্ছে দু'খন্ডে 'A History of Hindu Chemistry' বইটির জন্য, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চার উন্নতির ক্ষেত্রে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা ও মানসিকতা উৎসাহজনক অথবা নিরুৎসাহকারক এমনকি ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে এবং সেটা ভারতে হয়েওছে।

দ্বিতীয়টা হল বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফারমাসিউটিক্যাল তৈরি। এটা শুধুমাত্র স্বদেশী উদ্যোগই ছিল না, বরং দেশীয় এবং স্থিতিশীল (Sustainable) ভারী রসায়ন শিল্পের একটা বিরল নিদর্শনও বটে।

আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা তিনি তাঁর পড়ানো, গবেষণা এবং শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উপাদানগুলোকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সত্যিকথা বলতে কি তিনি পশ্চিমের বিজ্ঞানচর্চাকে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন যাতে তা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিময় করে। তিনি বুঝেছিলেন ভারত অচিরেই এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে এবং সেই কারণে এটা খুবই জরুরি। একাজে তিনি তাঁর জীবন

দিয়েছিলেন। যা কিছু তিনি করেছিলেন, তা শুধুই মানুষের কথা মাথায় রেখে, সমাজের জন্য, দেশের জন্য। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিজ্ঞান, সমাজ ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের ওপর গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন, এমনকি তা জে. ডি. বারনাল, জে. নীডহ্যাম ও জে. বি. এস. হ্যালডেনেরও আগে। এখানেই তিনি বিরল, অসাধারণ এবং সমস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীর মধ্যে পথিকৃৎ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাদের সমাধানের রাস্তারও হদিস দিয়েছিলেন।

আরেকজন বিজ্ঞানী যাঁর নাম আমি এ প্রসঙ্গে করতে চাই তিনি হলেন শম্ভুনাথ দে। স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী সময়টা হল তাঁর কাজের সময়। তাঁর কলেরা টক্সিনের ওপর কাজ জগৎবিখ্যাত, কিন্তু আজ কটা লোকই বা তাঁর নাম জানে? তিনিও কোলকাতাকেই তাঁর কাজের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ভারতে তিনি খুব একটা পরিচিত নাম না হলেও ব্যাকটিরিয়া বিশেষজ্ঞ এবং কলেরা গবেষক হিসাবে সারা পৃথিবীতেই তিনি সমাদৃত। কোলকাতায় উনি একটি প্রাক-স্নাতক মেডিকেল কলেজে প্যাথোলজিস্ট হিসাবে কাজ করতেন। প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে চলে আসা একটি ভুল বিশ্বাসকে সংশোধন করেছিলেন তিনি। অথচ এই ভুল ধারণাটির উৎপত্তির মূলে ছিলেন রর্বাট ককের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ড. দে প্রমাণ করেছিলেন কলেরাতে রুগী ব্যাকটেরিয়া জনিত বিষক্রিয়ার (Bacterial toxin) কারণে মারা যায় না। মারা যায় সার্বিক ও দ্রুত জলশূন্যতা ও লবণ ঘাটতির কারণে যা টক্সিনটি অন্ত্র থেকেই প্রণোদিত করে। এই টক্সিনটির নাম তাঁরা দিয়েছিলেন কলেরা এন্টেরোটক্সিন (Cholera Enterotoxin)। এই অসামান্য আবিষ্কারটি তিনি করেছিলেন একটি খুবই সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা যার নাম র‍্যাবিট ইলিয়াল লুপ টেকনিক (Rabbit ileal loop technique)। নেচার পত্রিকায় 1959 সালে তাঁর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাটিই পরবর্তীকালে কলেরা বা ঐ জাতীয় অন্যান্য আন্ত্রিক সংক্রমণের প্রতিকার হিসাবে ORS (Oral Rehydration Solution) এর কার্যকারিতার ব্যাখ্যা জোগায়। মূল প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে এসে আরও একটা কথাও জানিয়ে রাখা ভালো যে কোলকাতারই আরও একজন চিকিৎসক, ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশ 1972 সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে অসংখ্য আগত শরনার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকার শিবিরগুলোতে ORS দিয়েই সুস্থ করেন এবং কলেরা চিকিৎসায় এর কার্যকারিতার পক্ষে নির্ণায়ক তথ্য পেশ করেন। ডাক্তার দে-কে নোবেল পুরস্কারের জন্য সিম্পোসিয়াম কমিটি 1978 সালে আমন্ত্রণ জানান স্টকহোমে একটি বক্তৃতা দেবার জন্য। অনেক সংশয়ের পরে তিনি কলেরা এবং আনুষঙ্গিক আন্ত্রিক রোগের ওপর তাঁর বক্তৃতাটি সেখানে দেন। তিনি তাঁর loop technique পরীক্ষাতে কিভাবে উপনীত

হলেন এবং কিভাবে পরীক্ষা করে কি সিদ্ধান্তে এলেন তার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে সেখানে উপস্থিত বিদগ্ধ বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার শেষ অংশটি আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, 'বন্ধুরা শেষ করার আগে আমি দু-একটা ব্যক্তিগত কথা একটু বলতে চাই। ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকে আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম। কলেরা এন্টারোটক্সিনের ওপর আমার কাজকর্মও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার এই সামান্য টাকাকড়ি আর যৎসামান্য প্রযুক্তি দিয়ে আমি যেভাবে চাইছি সেভাবে কাজটাকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। নোবেল সিম্পোসিয়াম কমিটিই, বলা যায়, আবার আমাকে বাঁচিয়ে তুলল। আমার আজ এটা দেখে ভালো লাগছে যে আরও অসংখ্য গবেষক, বিজ্ঞানী, যাঁদের অনেকেই আজ এখানে এসেছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন তাঁরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, একান্ত অধ্যবসায় এবং পর্যাপ্ত সম্পদকেও এই গবেষণায় নিয়োজিত করেছেন।'

স্টকহোম বক্তৃতার বছরখানেক আগে শম্ভুনাথ দে একটি যন্ত্রণাবিদ্ধ চিঠি লেখেন। উনি লেখেন, 'উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা কল্পনাই করতে পারবেন না যে উদ্যমী লোকজন, যথেষ্ট যন্ত্রপাতি, এসব ছাড়া গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়াটা কত কঠিন, বিশেষত আমাদের মতো দেশে। বর্তমানে আমি একটি মুদীর দোকান চালাই বলতে পারেন। আমার বাড়িতে একটি রক্ত পরীক্ষার ল্যাবরেটরি খুলেছি (Clinical Diagnostic Laboratory)। এইটাই এখন আমার শখ যা আমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখে আবার সারাদিন এসব নিয়ে ব্যস্তও থাকতে পারি। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে আমি মানুষের জন্য অন্তত কিছু কাজ করতে পারছি।

সময়টা মনে রাখুন। উনিশশো ষাটের দশকের গোড়ার দিক। ডাক্তার দে তখনও চাকরী করছেন এবং বছর পঞ্চাশ বয়স তখন ওনার। মেডিকেল কলেজে সারাদিনের চাকরীর পর বোস ইনস্টিটিউটের সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রোটিন গবেষণাগারে ডাক্তার দে দিনের পর দিন গভীর রাত অবধি কাজ করতেন। তবুও তাঁর স্তরের একজন বিজ্ঞানী শুধুমাত্র উপযুক্ত লোকজন, প্রযুক্তি আর টাকা পয়সার অভাবে নিজেকে মৃত বলে মনে করছেন। সত্যি কথা বলতে কি গবেষণার জন্য তাঁর উদ্যমকে খ্যাপামি মনে করতেন অনেকে, চারপাশের লোকজনের বিন্দুমাত্র সমর্থন তো পেতেনই না, ঈর্ষাও করতেন কেউ কেউ। স্বাধীন ভারতের তখনও খুব বেশি বয়স হয়নি। কিন্তু আমলাতন্ত্র আর লাল ফিতের ফাঁস তখনই স্বাধীন মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। উনি চাইছিলেন ভারতের মতো দেশে বিশেষত বাংলাতে কাজে লাগে এরকম কোনো সমস্যাকে নিয়ে

কাজ করতে। এজন্য ইউরোপ এবং আমেরিকায় কাজ করার আহ্বান বার বার প্রত্যাখান করতে কুণ্ঠিত হননি। বহু বাধা বিপত্তির সঙ্গে বীরের মত লড়াই করে অবশেষে স্বাধীন ভারতে তিনি হেরে গেলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মারা যান 1944 সালে। বেঙ্গল কেমিক্যালসের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের সদস্য থাকাকালীন 1940 সাল নাগাদ ওনার সঙ্গে বোর্ডের বাকি সদস্যদের একটা বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য হয় এবং উনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ছেড়ে দেন। সেই সময় অবধি বেঙ্গল কেমিক্যাল অনেক বাধার মুখে পড়েও একটার পর একটা সাফল্যের মুখ দেখে। বেঙ্গল কেমিক্যালের মুম্বাই ইউনিট-টি যে জমিতে খোলা হয় সেটি নাম মাত্র দামে (এক টাকায়) তাঁকে হস্তান্তরিত করা হয়। স্বাধীনতার পর খুব বেশিদিন লাগেনি বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো একটি সংস্থার রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে যেতে। আজকের বেঙ্গল কেমিক্যালস তো জীবন মৃত্যুর মাঝে দোদুল্যমান। সংস্থাটির সমস্ত সম্পদ হয় বিক্রি হয়ে গেছে নয় ভাড়া দেওয়া হয়েছে বাড়ি বানানোর জন্য বা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজ ও ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে, পরের যুগের বিজ্ঞানীরা তাঁকে বিজ্ঞানী হিসাবে পাত্তাই দিতে চান না। চরমপন্থী রাজনীতির কিছু মানুষ তাঁকে মনে করেন ব্রিটিশের দালাল এবং 1970 সালে তাঁর মূর্তির মাথাও কাটা হয়। ঘটনাচক্রে যদিও তাঁকে আজও আমরা পূজো করি, কিন্তু তাঁর অবদানকে ভুল বোঝা হয় এবং তাঁর শিক্ষাকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আজ এমন একটিও প্রতিষ্ঠান নেই যা তাঁর চিন্তা ভাবনা আদর্শ ও পন্থা মেনে চলে বা কাজ করে। এস. এন. দে অবশ্য তাঁর বেঁচে থাকাকালীন অবস্থাতেই (যখন তিনি পুরোদমে কাজের মধ্যে আছেন) স্মৃতির অতল অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং শম্ভুনাথ দে তাঁদের চারপাশের মানুষদের সেবায় বিশ্বাস করতেন, যদিও বিজ্ঞানচর্চাই ছিল তাঁদের প্রধান আগ্রহ। কিন্তু সেই বিজ্ঞানচর্চার যা ফলাফল তা একই সঙ্গে জাতীয় স্তরে আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, দুজায়গাতেই প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক ছিল। তাঁরা দুজনেই কাজ করেছেন ভারতের মানুষদের কথা মাথায় রেখে কিন্তু তাঁদের কাজের তাৎপর্য ছিল বিশ্বজনীন।

বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্বের কথা আজকাল মানুষ ভুলে গেছে। তার জায়গায় এসেছে কর্পোরেটদের সামাজিক দায়িত্বের বাগাড়ম্বর। তার কারণ বোধহয় অধিকাংশ বিজ্ঞানীকেই কর্পোরেট দুনিয়া এখন গিলে ফেলেছে। আমরা আজকাল ভেতর থেকে উন্নয়ন নির্মাণের চাইতে বাইরে থেকে উন্নতি আমদানিতে বেশি বিশ্বাস করি।

1940 এর দশকে এবং 1960 এর দশকের মধ্যে এমন কি ঘটল ভারতে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হলে দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা সঠিক খাতে বইবে এবং দেশের উন্নয়ন হবে, দেশের কোটি কোটি অন্ধকারে থাকা মানুষ আলোর দিশা পাবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা, লোকের মানসিক চরিত্র কি এমন হয়ে গেছে যে তা বিজ্ঞানের উন্নতিতে বাধা দেয়? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেকগুলো আছে। কেন আমাদের তৈরি বিজ্ঞানীরা দেশের কাজে আসে না? স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি কি এমন ফসলই ফলায় যা পাশ্চাত্যের উপযোগী এবং পাশ্চাত্যেই যাদের বাড় বাড়ন্ত সম্ভব? আমরা কি প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের বিকাশের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ? আমাদের বিজ্ঞান গবেষণা কি ভারতের সমাজ ও মাটির চাহিদাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ? অসততা কি আমাদের চরিত্রের মধ্যে ঢুকে থাকা এমন একটা রোগ যা এমনকি বিজ্ঞানীদেরও রেয়াত করছে না?

এই প্রশ্নগুলোর সৎ উত্তর খোঁজা আমাদের পক্ষে খুবই জরুরি। কাজটাও কঠিন। কিন্তু কঠিন গবেষণার দ্বারা এই জরুরি প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই হবে। এই দেশের অনেক বিজ্ঞানী ও নেতা স্থানীয় মানুষদের মতো আমি এসব প্রশ্নের চটজলদি কোনো উত্তর দিতে পারবো না। এই সব রোগের নিদানও আমার জানা নেই কিন্তু আমি আমার কিছু অভিজ্ঞতাকে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

।। পাঁচ।আন্তর্জাতিক বনাম আঞ্চলিক

আজকের ভারতে একটা ভুল আমরা প্রায়ই করে থাকি। আমরা মনে করি বিজ্ঞান মূলত আন্তর্জাতিক, বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বিজ্ঞানের কোন আঞ্চলিক চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ, এককথায়, বিজ্ঞান স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ সত্যের কারবারী। কিন্তু এই ভাবনা যদি ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের বড় বড় ভুলের ফাঁদে পড়তে হবে।

বিজ্ঞান, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান, মানুষের বেঁচে-বর্তে থাকায় যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই একটা সমাজ, তার সংস্কৃতি, ইতিহাস ও পরিবেশের আবহেই তাকে সক্রিয় থাকতে হয়।

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক জলের কথা। রাসায়নিক ভাবে তা পৃথিবীর সব জায়গায় সবদেশেই সর্বকালে এক। কিন্তু বৃষ্টির জলের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য নয়। জায়গা ও সময়ের ওপর নির্ভর করে বৃষ্টির জলে মিশে থাকতে পারে বিভিন্ন পরিমাণে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাস এবং তাতে জলটা মৃদু আল্লিক বা ক্ষারীয় হতেই পারে। ভূগর্ভের জল বা ভূপৃষ্ঠের জলও স্থান কাল ভেদে ভিন্ন হয়, কারণ নানারকম যৌগ বিভিন্ন অনুপাতে সেইসব জলে দ্রবীভূত থাকে এবং ফলে তাদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক সময় থেকে অন্য সময়ে যথেষ্ট পাল্টে যায়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কোনো জায়গা নেই, এই ধারণাটাকে আধুনিক আবিষ্কারগুলো ও চিন্তাভাবনা সমর্থন করে না। উল্টোদিকে দিন দিন একথা বেশি করেই স্পষ্ট হচ্ছে বা জোরালো হচ্ছে যে মানুষের বাসস্থান হিসাবে বসুন্ধরা ততদিনই টিকে থাকতে পারবে যতদিন পর্যন্ত আমরা এর ভূ-জীব-বৈচিত্র্য এবং পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে পারবো।

বড় বড় তাত্ত্বিক বা আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা এবং নোবেল প্রাইজের জন্য দৌড়নো—এটা অসাধারণদের কাজ হতেই পারে, কিন্তু সাধারণ গবেষণাকর্মীর পক্ষে, একেবারে সাধারণ দেশীয় ও স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কাজ করা, মানুষের ছোটো ছোটো দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবাটাই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব সম্মত। এই রাস্তাই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানে পৌঁছে যাবার মহাসড়ক এবং তা বার বার প্রমাণিত।

।। ছয়।। শনিবারের বিজ্ঞান শেখার ক্লাব, একটি অভিজ্ঞতা

এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের একটি অভিজ্ঞতার কথা একটু বলতে চাই। ছোটোদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা তৈরির জন্য আমরা 1990 এর দশকে গড়ে তুলেছিলাম শনিবারের বিজ্ঞান শেখার ক্লাব। প্রত্যেক শনিবার, পূর্ব কোলকাতার একটি জায়গায় আমরা মিলিত হতাম। সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির অনেক ছেলেমেয়ে আসত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বইয়ে যেসব তত্ত্ব তারা পড়ে সেগুলো হাতে কলমে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অনুশীলন করে তারা নিজেরাই বিজ্ঞানকে শিখুক ও ভালোবাসুক। ব্যবহার করুক যতদূর সম্ভব সুলভ এবং হাতের কাছেই পাওয়া যায় এমন সব উপকরণ। কাছাকাছি স্কুলের ছেলেমেয়েরা খুবই উৎসাহ নিয়ে যোগ দিল। সল্টলেকের দুটো স্কুলের ছেলেমেয়েরাও সেখানে ছিল। এই স্কুল দুটো বোর্ডের পরীক্ষায় তাদের খুব ভালো রেজাল্টের জন্য অতিপরিচিত। এইসব স্কুলের ছেলেমেয়েরা সাধারণত উচ্চতর আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিবার থেকে আসে এবং সেটা তাদের দেখে বোঝাও যায়। অতি সাধারণ স্তরের কয়েকটি স্কুলের ছেলেমেয়েরাও সেখানে আসত। এই স্কুলের ছেলেমেয়েগুলি আবার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান এবং সেগুলোও তাদের চেহারা, জামাকাপড়, চালচলন ইত্যাদি থেকে বোঝা যেত। আমরা ইচ্ছে করেই চাইতাম সব স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা যাতে একসঙ্গে এক একটা দলে থেকে কাজ করে।

একদিন ক্লাস সেভেনের ছাত্রছাত্রীদের বলা হল যে একটা ছোটো শিশিতে যেকোন একটা পদার্থকে (matter) সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। উনিশ জন যোগদানকারীর মধ্যে ন'জন আনলো মাটি, সাতজন আনল সাধারণ লবণ, দুজন চিনি এবং একজন ফাঁকা শিশিটাকেই নিয়ে চলে এল। সেই ছেলেটি একটি তথাকথিত ভালো স্কুলের ছাত্র। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে বলল খুব দুঃখিত স্যার, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাকে বোঝালাম যে সেও একটি 'পদার্থ' এনেছে এবং সেটা হল হাওয়া বা বায়ু। এটা অন্য কেউ আনতে পারেনি। সে লাজুক হাসল কিন্তু অন্যরা খুবই প্রতিবাদ করল। তারা বলল, সেটা কি করে হতে পারে, স্যার, ওর পাত্রটা তো ফাঁকা ছিল। এটা বোঝাতে ওদের কিছুটা সময় লাগল যে তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থরাও কঠিন পদার্থর মতোই আরও এক একরকম পদার্থ এবং আমাদের চারপাশে একেবারে ফাঁকা জায়গা বলে কিছু থাকতে পারে না। যদিও সেটা পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা যায়।

বায়ু যে একটা পদার্থ এবং এরও যে ওজন আছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা ঠিক করলাম গ্যাস ভর্তি একটা বেলুনের ওজন নেওয়া হবে। কাঠ এবং নাইলনের দড়ি দিয়ে একটা দাঁড়িপাল্লা তৈরি করা হল। দড়ি দিয়ে ঝোলানো এই রকম একটা দাঁড়িপাল্লায় দুদিকের ওজনে সমতা আনা একটু কঠিন কিন্তু কোনো মতে তাও করা গেল। শেষ পর্যন্ত ওদের বোঝানো গেল যে গ্যাস ভর্তি বেলুনটা ফাঁকা বেলুনের চেয়ে ভারি।

জলের অম্লত্ব (pH) মাপার একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। নানারকম উৎস থেকে নেওয়া জল, যেমন পুকুর, টিউবওয়েল, বৃষ্টির জল এগুলোর সবকটির-ই পি. এইচ (pH) মাপা হল pH Paper দিয়ে। অ্যাসিড বৃষ্টি এবং অ্যাসিড জলের অস্তিত্ব ছেলেমেয়েরা সহজেই মেনে নিল। একটা ফুরিয়ে যাওয়া Dry Cell ব্যাটারি (শুকনো কোষ বা ড্রাই সেল) থেকে কার্বন রড আর দস্তার পাতের টুকরো দিয়ে ব্যাটারি বানানো হল এবং তারা একটা কাচের মধ্যে দুভাগ করা লবণ জলে খোপের মধ্যে তড়িৎবিশ্লেষণ (Electrolysis) প্রক্রিয়া চাক্ষুষ করতে পারল।

বছর খানেক আমাদের এই ক্লাবটা ভালোই চলল। তারপর দুটো সমস্যা এল। সল্টলেকের তথাকথিত ভালো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কিছু প্রশ্ন তুলতে শুরু করল। যেমন তারা বলল, তাদের স্কুলে ডিজিটাল pH মিটার আছে যা pH পেপারের থেকে অনেক ভালো ফল দেয়, pH পেপার দিয়ে করা পরীক্ষায় খুবই বিভ্রান্তিকর ফল আসে। তাদের স্কুলে ইলেক্ট্রোলাইসিস পরীক্ষার জন্য Hoffman Apparatus আছে, Electrolysis cell তৈরি করার জন্য খেটে কি হবে? এই জাতীয় প্রশ্নগুলো গুরুত্ব দিয়ে শোনা হত এবং আলোচনাও করা হত। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের শরীরের ভাষা পাল্টে যাচ্ছিল।

তারা বলতে শুরু করল কেন তারা নষ্ট হয়ে যাওয়া দস্তা বা (Zinc) কার্বন নিয়ে কাজ করবে, এর থেকে তো বিষক্রিয়ারও সৃষ্টি হতে পারে। এমন সব তাত্ত্বিক প্রশ্ন করতে শুরু করল যেটা তাদের আয়ত্ত্বের বাইরেই থাকা উচিত। যেমন, 115 বা 118 পরমাণু সংখ্যার মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব কি সম্ভব? 118 পরমাণু সংখ্যার কোনো মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হলে সেটা 115 পরমাণু সংখ্যার মৌলিক থেকে বেশি স্থায়ী হবেই কি? প্রকৃতিতে আরও কোনো মৌলিক পদার্থ যে আবিষ্কৃত হবে না তা আমরা কি করে বলতে পারি? এই রকম সব প্রশ্ন। যখন তারা এই সব প্রশ্নগুলো করত, তখন সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েরা চুপচাপ ও উদাসীন হয়ে পড়ত। সল্টলেকের স্কুলগুলোর ছেলেমেয়েরা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তারা সাধারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশ্র গ্রুপে থাকতে চায় না। এইসব সূত্র ধরে বিভ্রান্তি এবং ভুলবোঝাবুঝি বেড়েই চলল। আরেকটা বাইরের দিক থেকে আসা সমস্যাও ঝামেলা বাঁধাল। কিছু স্থানীয় ছেলে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আমাদের কাজকর্মে গভীর উৎসাহ দেখাল এবং যোগ দিতে চাইল। তারা কয়েক সপ্তাহ অন্তর এক-আধবার আসত এবং কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলত। বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়ে তাদের যত না উৎসাহ ছিল, তার চেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল ছাত্রছাত্রীদের 'বিজ্ঞানের সঠিক দর্শন' বোঝাতে। তাদের মতে এইসব অভিজ্ঞতার দ্বারা বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ভালো কাজ কিন্তু তার চেয়েও দরকারী কাজ হল রাজনৈতিক দিশা সঠিক থাকা।

দ্বিতীয় বছরটাও কেটে গেল, যদিও হাজিরা ততদিনে কমে গেছে—বিশেষত সল্টলেকের স্কুলগুলোর ছেলেমেয়েদের। তৃতীয় বছরে শুধুমাত্র সাধারণ স্কুলগুলোর কিছু ছাত্রছাত্রীই উপস্থিত থাকতে শুরু করল। কিন্তু তারা খুবই উৎসাহী ছিল। আমাদের দলে সবচেয়ে সক্রিয় এবং উৎসাহী ছিল একজন সরকারী কর্মী। সে আন্দামানে বদলী হয়ে গেল। আমাদের বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

আমার মনে হয় আমাদের এই পরীক্ষাটা যে প্রশ্নগুলোকে আমরা এতক্ষণ ধরে তুলতে চেয়েছি, তার কিছু উত্তর জোগাবে। যাঁরা ইন্ডিয়ান সোশ্যাল সায়েন্স কংগ্রেসের 2007-এর অধিবেশনে (যেটা ট্রম্বের হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশনে হয়েছিল) উপস্থিত ছিলেন তাঁদের হয়ত মনে পড়তে পারে যে আমাদের দেশের বিজ্ঞান চর্চার করুণ অবস্থা নিয়ে সেখানে সমস্ত বক্তারাই তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। কোলকাতায় 2009 এবং 2014-তে যে দুটো সিম্পোসিয়াম এই বিষয়ে হয়েছিল তাতেও এই একই কথার আলোচনা হয়। যদিও এই আলোচনাচক্রগুলিতে ছোটোদের বিজ্ঞানমুখী করার জন্য সাধারণ কিছু দিক নির্ণয় করার চেষ্টাও হয়।

।। সাত।। মানুষের জন্য বিজ্ঞান

আমরা কি সবাই চুপ করে বসে থাকব? আমরা কি করতে পারি? ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে দেশের সম্পদকে ব্যবহার করার কাজে, যাদের এটা সবচেয়ে বেশি করে দরকার সেই সব গরীব মানুষদের বেঁচে থাকা সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে কি করার আছে? প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা আছে তাতে এই লক্ষ্যে কোন কাজ ও তার সুফলের আশা সুদূর পরাহত। মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেবার জন্য হাজারটা সরকারি কর্মসূচি আছে, টাকা পয়সার অনুদান আছে, কিন্তু সেগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হয়? ঠাণ্ডা ঘরে পেপার পড়া, সেমিনার করা অথবা পেটেন্ট করা, বিদেশ যাওয়া ইত্যাদি বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থতাই সেখানে মুখ্য।

এমনকি যেখানে সরকারও ব্যর্থ হয়, সাধারণ মানুষ সফল হয়। ভারতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে যারা সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করে। শিক্ষা নিয়ে কাজ করে, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, নারীর অধিকার, শিশুর বিকাশ নিয়ে ভাবে, লড়াই করে। কিন্তু এরকম একটিও সংস্থা নেই যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের ভালোর জন্য কাজে লাগানোর পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন সামাজিক অধিকার রক্ষার লড়াই-এ যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউই প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য পান না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন কোন বন্ধু সংগঠন নেই যারা এদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকরকম বিকল্প তৈরি করা যেতেই পারে। একটা মঞ্চ তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে দেশের ও বিদেশের বিজ্ঞানীরা অন্যান্য ক্ষেত্রের সমদরদী মানুষদের সঙ্গে একত্র হতে পারেন। শিক্ষাবিদরা সেই মঞ্চে আসতে পারেন, সমাজবিজ্ঞানীরা আসতে পারেন, অন্য ক্ষেত্রের মানুষজনও আসতে পারেন। তাঁরা দেশের মানুষকে, তাঁদের সংস্কৃতি ও পরিবেশকে বুঝে, জেনে এমন সব জিনিষের গবেষণা বা আবিষ্কার করবেন যা একই সঙ্গে সামাজিক ভাবে উপযোগী এবং পরিবেশগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিশ্বাসের এমন একটি আবহাওয়া তৈরি হলে তার থেকে হয়ত অজস্র ভালো জিনিস বেরিয়ে আসবে।

দুটো জায়গায় মূলত দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জানতে চাওয়ার ইচ্ছেটাকে উপভোগ করতে এবং ভালোবাসতে শেখাতে হবে এবং দুই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর পথ খুঁজতে হবে। যাতে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এর মধ্য দিয়েই আঞ্চলিক ভাবে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাবেও মানুষের সভ্যতা নতুন কোনো উচ্চতায় পৌঁছতে পারে।

এরকম প্রচেষ্টা আগেও হয়েছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আজ থেকে পায় 150 বছর আগে ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর দা কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের গোড়াপত্তন করেন, লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন আজ ভারতের একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কেন্দ্র, কিন্তু এটি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। মূল ধারার আর পাঁচটা সংস্থার মতোই এখন এর হাল, মূলত সরকারী অনুদানের কারণে; এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের টাকাতেই চলে।

আজকে যেসব ভারতীয় বিজ্ঞানী দেশে এবং বিদেশে কাজ করছেন তাঁদের অনেকেই খুবই সাধারণ পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন এবং দেশের প্রতি তাঁদের টান অকৃত্রিম। তাঁরা জ্ঞানচর্চাকে মানুষের ভালোর জন্য কাজে লাগাতে চান, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক প্রথাপদ্ধতি (System) প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আমি দু একজন বিজ্ঞানীকে জানি যাঁরা বিদেশে থাকেন এবং নিয়মিত তাঁদের গ্রামের বাড়িতে যান এবং টাকা পয়সা ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে গ্রামের মানুষদের সাহায্য করেন। এইরকম একটি সহযোগী সংস্থা গঠনের দ্বারা এই কাজটিকেই আরও সংগঠিত ও আরও বড় আকারের করা যায় না? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতের অসংখ্য মানুষ, যাঁরা দেশে বা বিদেশে কাজ করছেন, এর দ্বারা তাঁদের আশা পূরণ হতে পারে। আমার মনে হয় তাঁরা তাঁদের জ্ঞান, পারদর্শিতা, সময় এবং এমনকি টাকারও সামান্য অংশ সানন্দে দিতে রাজি হবেন মানুষের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে তৈরি এই ধরনের সংগঠনের জন্য।

প্রথম লক্ষ্যটি পূরণের জন্য নতুন কোনো বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার নেই। ছোটো ছোটো স্বল্প সময়ের শিক্ষণ শিবির তৈরি করাই যেতে পারে যেখানে কলেজে ভর্তি হতে চলেছে এরকম কিছু নির্বাচিত তরুণ তরুণী কয়েকটা দিন এমন কিছু মানুষের সঙ্গে থেকে, কিছু করে, কিছু খুঁজে দেখার চেষ্টা করে কাটাবে যাঁরা জীবনকে ভালোবাসেন, নতুন কিছু জানাকে উপভোগ করেন। সর্বদা এমন কিছু করতে চান—বিজ্ঞান বা অন্য কিছু—যা জীবনকে পূর্ণতা দেয়, যাঁরা কাজ করে পান আনন্দ আর পরিতৃপ্তি। এইরকম লোকজন আমাদের চারপাশে অনেকেই রয়েছেন, কিন্তু সাধারণত তাঁরা কোনো স্বীকৃতি পান না। এইসব মানুষদের সংখ্যা আজকের সমাজে হু হু করে কমে যাচ্ছে, একদিন হয়ত এনারা লুপ্তই হয়ে যাবেন। যে ছেলেটা বা মেয়েটা একটা বৃহত্তর জীবনের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তারা যদি কয়েকটা দিন এইরকম মানুষদের কাছ থেকে কাজের আনন্দের অনুপ্রেরণা আর ভালোবাসা মাখা হৃদয়ের ছোঁওয়া নিয়ে জীবন শুরু করে, কি ভালোই না হয়। এই সব নবীন মানুষেরা অন্তত কেউ কেউ এই অভিজ্ঞতাটাকে সারাজীবনই হয়ত মনে রাখবে। তা তারা যাই করুক, যেখানেই থাক এবং তারাই হয়ত একদিন মানুষের জন্য বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় উৎসাহী কর্মী হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ণের জন্য অসংখ্য জিনিস করা যেতে পারে, অবশ্যই কাদের জন্য কাজটা করা হচ্ছে এবং তাদের পরিবেশের কথা মাথায় রেখে। খুব সাধারণ থেকে অতি বিশিষ্ট যেকোন রকমের কাজ হতে পারে। একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকেই হয়ত দেখেছেন, ছোট ছোট সাইকেলের দোকান গুলোতে সাইকেলের চাকায় হাওয়া দেবার পাম্প ব্যবহার করতে ইদানিং চীনে তৈরি একধরণের পাম্প খুবই বাজারে চলছে। পাম্প গুলো সস্তা, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং প্রচলিত দেশি পাম্পগুলোর থেকে বেশি কার্যকারী। পাম্পের ভাল্বগুলির কাজ করার পদ্ধতি সামান্য পাল্টে দিয়েই পাম্পের গুণগত মান অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। আরেকটা আরও ভালো উদাহরণ হল আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড মুক্ত জলের ব্যবস্থা করা। বড় বড় উদ্যোগ-টুদ্যোগ যাই নেওয়া হোক না কেন এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ, প্রধানত গ্রামাঞ্চলের, এর দ্বারা আক্রান্ত। এই সমস্যাটার সমাধানের জন্য সূর্যের তাপকে ব্যবহার করে একটা পারিবারিক সৌর পাতন যন্ত্র বানানো সম্ভব যার রক্ষণাবেক্ষণ খুবই সহজ। বাড়ির প্রতিদিনের পানের ও রান্নার জল অন্তত এভাবে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড বিষ মুক্ত করে নেওয়া যায়। এই সমাধানটা হয়ত সবজায়গার লোকের পক্ষে সমান উপকারী হবে না, কিন্তু এইসব উদ্যোগ আমাদের বিজ্ঞানীকূলকে হয়ত ভাবিত করবে। তাঁরা হয়ত উৎসাহিত হবেন এই ধরনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে। যদি আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বড় বড় আবিষ্কার করে থাকতে পারি, তবে এই সব সাধারণ জিনিস যা মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকাকে সহজ ও সুগম করবে তা তৈরি করতে পারব না কেন? সবচেয়ে বড় যেটা দরকার সেটা হল দুটো প্রান্তকে এক জায়গায় আনা। আমআদমীর জন্য বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি কি এটা করে উঠতে পারবে না?

আমাদের মতো দেশে এইরকম কেন্দ্র হাজার হাজার সংখ্যায় হওয়া দরকার এবং এই কেন্দ্রগুলি একটি জাতীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। এই জাতীয় কেন্দ্রটির নাম করণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর নামে হওয়া উচিত। অবশ্য এটা আমার একটা প্রস্তাব মাত্র। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্তরের বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলিকেও অন্যান্য জনপ্রিয় বিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীদের নামে করা যেতে পারে। এইসব কেন্দ্রগুলি যাতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে তারও রাস্তা বের করা দরকার।

এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান সোশ্যাল সায়েন্স একাডেমি এবং পিপলস কাউন্সিল অফ এডুকেশন, সারা দেশের অনেক বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র তৈরি করেছে। তাঁরা কি আমার এই কর্মমুখী প্রস্তাবটিকে একটা কার্যকরী চেহারা দিতে পারেন না?

যুক্তি-বিতর্ক-মীমাংসা : অম্লান দত্তের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

সুভাষ রায়

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কানেটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা

সদ্যপ্রয়াত মনস্বী অম্লান দত্তের এটাই অন্যতম পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক। এছাড়া অন্য অনেক ভূমিকায় তাঁকে দেখেছি—কখনো বাংলা বা ইংরিজি ভাষায় প্রবন্ধ লেখক, কখনো পত্রিকা সম্পাদক[1], আবার কখনো বা উত্তরবঙ্গ বা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান মোটেই শুধুমাত্র ক্লাসরুমে ছাত্রদের পড়ানোর মধ্যে সীমিত ছিল না। কিন্তু সবসময়েই তিনি তাঁর ভাবনা চিন্তাকে প্রসারিত করে আমাদের সমাজ চেতনাকে আরো সংবেদনশীল করে তুলতে চেয়েছেন। অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব বা দুরূহ বীজগণিত নয়—তাঁর ছাত্র হিসেবে সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা যা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ভিন্নমতের প্রতি সৌজন্য ও সহিষ্ণুতা।

অর্ধশতাব্দী আগে ষাটের দশকের গোড়ায় আমরা কতিপয় নবীন যুবক বরানগরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। রাজাবাজারে প্রেসিডেন্সি কলেজের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হস্টেলে থাকি। তার আগে দু'বছর প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক ভবতোষ দত্তের কাছে জটিল অর্থশাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পেয়ে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্লাসেই শিক্ষকদের মামুলি বক্তৃতায় মনোনিবেশ করতে কষ্ট হয়। শুধু মুষ্টিমেয় যে ক'জন মাস্টারমশাই সবসময়েই আমাদের আকৃষ্ট করতেন অম্লান দত্ত তাঁদের অন্যতম। দু'বছরের পাঠ্যক্রমে তিনি আমাদের দু'টি বিষয়ে পড়িয়ে ছিলেন। তার একটি হল অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনের ইতিহাস। অন্যটিও ইতিহাসের পাঠ—সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস। একথা অস্বীকার করতে পারি না যে তখন জ্ঞানার্জনের চাইতে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাবার চিন্তাই প্রাধান্য পেতো। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সেই বক্তৃতামালার উপযুক্ত কদর করতে শিখেছি। অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সাধারণত গ্রীস ও রোমের পন্ডিতদের থেকে আরম্ভ করে নব্য যুগের অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর সমকালীন ধ্রুপদী (ক্লাসিক্যাল) তত্ত্বের পরিক্রমা করে একেবারে

** এই অপ্রকাশিত রচনাটি অধ্যাপক দত্তের মৃত্যুর পরে একটি স্মরণ সভায় পঠিত হয়েছিল।*

তিরিশের দশকের কেইনসের পাঠ দিয়ে শেষ করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে পন্ডিতদের ভাবনার ক্রমবিকাশ পশ্চিমী (বিশেষ করে ইউরোপীয়) সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। উভয়ের এই নিবিড় সম্পর্ক সহজ করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে যে বিশেষ বোধ ও বাচনশৈলী প্রয়োজন তা খুবই কম শিক্ষকের থাকে। তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত দানের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুই বিকল্প পন্থা হল একদিকে বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিমালিকানা আর অন্যদিকে সরকারি মালিকানা ও সাম্যবাদ। এই বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত তিনি নানা রচনায় প্রকাশ করে গেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শগত বাদানুবাদ সবসময়েই দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি সরকারি মালিকানায় কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে শিল্পোন্নয়নের পথ অনুন্নত দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলির জন্যে কতটা বাঞ্ছনীয় সে প্রশ্ন তুলেছেন। আর ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে রাশিয়া বা জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে ভারতের উন্নয়নের পথ খুঁজে বার করাই তো এই ইতিহাস পাঠের আসল লক্ষ্য। মধ্যপন্থী সমাজবাদী কেরেনস্কিকে অপসারিত করে কম্যুনিস্ট পার্টির হয়ে লেনিনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, কৃষকদের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের বিবাদ, ব্যাপক শিল্পায়নের খাতিরে কৃষি থেকে সরকারি পুঁজি জমিয়ে তোলার পদ্ধতি নিয়ে বুখারিন ও প্রিয়োব্রাঝেনস্কির মধ্যে বিতর্ক কী অর্থে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনা) এবং তথাকথিত মহলানবিশ মডেলের সঙ্গে তুলনীয় সেইসব আলোচনা রাশিয়ার উন্নয়নের ইতিহাস পাঠ করতে আমাদের বেশি আগ্রহী করে তুলতো।

আজ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজের শিক্ষক জীবনের গোধূলি লগ্নে সেই সব কথা মনে পড়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হবার বহুকাল পরে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ হয় আমাদের সহপাঠী/সমকালীন কয়েকজন বন্ধুর ঘরোয়া বৈঠকে। আমি যে বছর শীতের পাখির মতো বড়দিনের অবকাশে দেশে ফিরতাম সেই সময়ে একদিন আমাদের এই আসর বসতো। অম্লান দত্ত আমাদের এই আসরে আসতেন। তাঁর সঙ্গে সমকালীন দেশি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতো। তিনি খুব সহজভাবে এই আসরে যোগ দিতেন। আমাদের সকলের মাস্টারমশাই হলেও তিনি আমাদের সকলের বক্তব্যই শুনতেন এবং ঐক্যমত বা বিরোধিতা প্রকাশ করতেন।

এককালে যাঁর সঙ্গে কথা বলতেই সংকোচ হতো সেই মানুষটির সঙ্গে সমানসমান মর্যাদায় কথোপকথনের সুযোগ পেয়ে ভালো লাগতো।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। তাঁর ভিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণুতা ছিল—কিন্তু অযৌক্তিক বিতন্ডা শোনবার ধৈর্য ছিলনা। কেউ বাজে তর্ক করলে তিনি তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন। মনে আছে আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমাদের আগের বছরের একজন ছাত্র তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলেছিল—

"Sir, I think this should be actually that"

তার উত্তরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন

"Is this a mathematical 'should' or an ethical 'should' ?"

আরও ব্যাখ্যা করে বললেন :

"2 plus 2 should be 4. This a mathematical 'should'. A thief should be handed over to the police, This is an ethical 'should'. "

আপাতদৃষ্টিতে একজন ছাত্রকে এভাবে প্রত্যুত্তর করা বেশ নির্মম বলে মনে হয়। আসলে কিন্তু তিনি ছাত্রটিকে করুণাপরবশ হয়ে তাচ্ছিল্য না করার বদলে তাকে একজন তার্কিকের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তার যুক্তিকে খণ্ডন করছিলেন।

অম্লান দত্তের জীবনাদর্শের মূলে ছিল গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় গণতন্ত্রের দুই রূপের কথা বলেছেন: তার একটি ব্যক্তিস্বাধীনতাকেন্দ্রিক আর অন্যটি সমষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষ অবাধে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারবে। সমষ্টিচালিত গণতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয় যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনৈক্য থাকলেও জাতীয়স্তরে সব নাগরিকের স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। রুশো বা হেগেল মনে করতেন যে সমাজের কিছু মানুষ (এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও) যদি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা করে তা হলেও একটা কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তব্য হবে জোর করে সমাজকে সঠিক পথে চালনা করা। এই সমষ্টিবাদী গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র গণস্বার্থ।[2] বলা বাহুল্য, অম্লান দত্ত এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণতন্ত্রেই সারা জীবন বিশ্বাস করে গেছেন।

অম্লান দত্ত সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর মতামত গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর সব ধ্যান ধারণা আমার সঙ্গে মেলে না। সম্প্রতি আমার একটি রচনার প্রাথমিক খসড়া পাঠ করে তিনি বলেছিলেন তাঁর বিচারে প্রবন্ধটি সুরচিত হলেও এর বেশ কিছু অংশের সঙ্গে তিনি

একমত নন। আমি তাঁর ভিন্নমতের অধিকারকে যথোচিত মর্যাদা দিলেও আমার মূল বক্তব্য থেকে সরে আসি নি। আসলে অম্লান দত্ত শিক্ষাগত ভাবে অর্থনীতিবিদ হলেও ভাবনা চিন্তার দিক থেকে একজন সমাজতত্ত্ববিদ ছিলেন। অন্যদিকে আমার ভাবনা চিন্তা (সামাজিক) লাভ-ক্ষতির দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের ভিন্নতমতের উৎসটা ছিল আমাদের দু'ধরনের মূল্যবোধ। আমার ধারণা আমার এই নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে থাকাটা তাঁর শিক্ষকতার সাফল্যেরই পরিচায়ক।

অম্লান দত্ত এক অর্থে শিক্ষিত বাঙালি মনীষার অভিভাবক ছিলেন। বর্তমান পরিবেশে যখন বহু বুদ্ধিজীবী বাঙালি এক অত্যাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চাটুকারিতা করে যাচ্ছেন, তাদের পাশাপাশি অম্লান দত্ত ছিলেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে বিবেকের তিরস্কার।

পরিশেষে, আমার নিজস্ব একটা মত প্রকাশ করি। বর্তমান শাসকগোষ্ঠির তুলনায় আগামী সরকার ভালো হবে না মন্দ সেটা আমার (বা কারুরই) জানা নেই। শুধু একটা কথাই স্মরণ করিয়ে দেব : মানুষ একটা মহৎ কিছু পাবার জন্যে লড়াই করে। কিন্তু যখন সেটা পেয়ে যায় তখন সে বুঝতে পারে যে জিনিসটাকে যা ভেবে সে এতকাল লড়াই করেছে বাস্তবে জিনিসটা তা নয়। কিন্তু মানুষ থেমে থাকে না। সে তার লক্ষ্যের নাম পাল্টে আবার সেই পক্ষিরাজ ঘোড়াকে খুঁজতে থাকে। মানব সভ্যতার এটাই নিয়ম।

পাদটীকা :

1 *আবু সয়ীদ আয়ুবের সঙ্গে* Quest *পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক।*

2 *এই বিষয়ে শ্রীদত্তের মতামতের বিশদ আলোচনার জন্য উৎসাহী পাঠক তাঁর লেখা* Socialism, Democracy, and Industrialisation (George Allen and Unwin 1962) *গ্রন্থে Two Conceptions of Democracy or A Critique of Collectivist Democracy প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।*

'উত্তরণ'-এর যাত্রাপথ

মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়

— আপনি কি ভগবান মানেন?
— মানে?
— মানে আপনাকে তো কখনও পুজোটুজো করতে দেখিনি তাই জিজ্ঞেস করছি।
— সেটাই তো জানতে চাইছি। এই উদ্ভট প্রশ্নটা করছো কেন?
— কারণ, হঠাৎ উপনিষদ নিয়ে পড়লেন তাই!
— ওহ্! তাই বলো! উপনিষদ পড়ার সঙ্গে ভগবান মানা বা না মানার তো কোন সম্পর্ক নেই।
— ও উপনিষদে বুঝি ভগবান নয় ভালবাসার কথা লেখা আছে?
— অবশ্যই ভালবাসার কথা লেখা আছে। মানুষকে ভালবাসার কথা, প্রকৃতিকে ভালবাসার কথা, কাজকে ভালবাসার কথাই তো লেখা আছে সেখানে।
— এবার কিন্তু সেই পুরোনো চালাকিটা হয়ে যাচ্ছে।
— পুরোনো চালাকিটা কী?
— যে চালাকির জোরে এত বছর মাঠ-ঘাট থেকে ছেলেগুলোকে তুলে এনে পড়তে বসিয়েছেন।
— সত্যিই কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তার মধ্যে আবার অনেকে ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাসও করেছে।
— হ্যাঁ, অন্যায়ই তো। জানেন আমার রেজাল্ট দেখে আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড় হয়েছিল?
— কই জানি না তো! তোমার বাবা রেজাল্ট দেখে প্রথমে আমাকেই ফোন করেছিলেন। আমার তো ওনার গলা শুনে মনে হয়েছিল ওনার হার্ট না হৃদয়কে যদি কেউ আক্রমণ করে থাকে সে এক অনাবিল আনন্দ।
— সত্যি! বাবাকে এতটা আনন্দ পেতে আমি আগে কখনও দেখিনি। আসলে বাবা তো কল্পনাই করেনি যে আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেতে পারি।
— এবার বল তো ভায়া, এখানে অন্যায়টা কোথায়?

— ছাড়ুন ওসব, বলুন না আপনি উপনিষদ নিয়ে পড়লেন কেন?
— শঙ্খশুভ্রকে চেন?
— হ্যাঁ। সায়ন্তদের ব্যাচের তো?
— হ্যাঁ। ও একদিন 'অমৃত গান' নামে একটা ক্যাসেট দিয়েছিল শুনতে, যেখানে শ্রীকান্ত আচার্য উপনিষদের সংস্কৃত শ্লোকগুলো অদ্ভুত সুরেলা ভাবে গেয়েছিল।
— হ্যাঁ, জানি, আপনি আমাকেও শুনিয়েছিলেন ক্যাসেটটা। তো সেটা শুনে আপনার কী মনে হল?
— আমি আগেও দু-একজনের মুখে উপনিষদ শুনেছি। কিন্তু সেগুলো এরকম গানের মতো নয়, মন্ত্রের মতো। তাই ভাবলাম ....
— মানে শুধু শ্রীকান্ত আচার্যকে দিয়ে গানের মতো করে উপনিষদ গাওয়ানোর জন্য একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেললেন?
— বেসিক্ মোটিভেশন সেটাই ছিল।
— কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের ঘটনা, যতদূর মনে পড়ছে সেটা 2003-04 হবে।
— হ্যাঁ। তোমার মনে আছে শ্রীকান্ত আচার্যের ফাংশন থাকলেই শ্রীতনু, পীতম ওরা আমাকে কার্ড দিত?
— হ্যাঁ, ওদের বাবাদের অফিসের ফাংশনের কার্ড। তো শ্রীকান্ত আচার্যর সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা হল কি করে?
— যোগাযোগ আর কি করে হবে? পীতম ফোন নম্বর দিল, আমি ফোন করলাম।
— ধ্যাৎ! এরকম আবার হয় না কি?
— হয় কি না জানি না। তবে যেটা হয়েছে সেটাই বলছি।
— ফোন করে আপনি কী বললেন?
— ঠিক কি বলেছিলাম মনে নেই। তবে মোদ্দা কথা এটাই বলেছিলাম যে আমি উপনিষদের ওপর রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে একটা ভাবনা ভেবেছি। আপনি করবেন?
— উনি কি বলেছিলেন?
— উনি বলেছিলেন আমি এখন দু'বছর রবীন্দ্রনাথের গান গাইব না।
— সেটা কোন সাল?
— 2005-06 হবে।
— তারপর?
— তারপর মাঝে মাঝে ফোন করতাম। কিন্তু সেই একই কথা, 'আমি এখন

রবীন্দ্রসংগীত করব না।'

— তারপর?

— তারপর 2007-এ আমার জন্মদিনে জিনিয়া আর ওর বন্ধু লোপা আমাকে নিয়ে গেছিল তেরো পার্বণ-এ lunch খাওয়াতে। সেখানে শ্রীকান্ত আচার্য আর ওঁর মা এসেছিলেন।

— তাই? আপনি কথা বললেন?

— হ্যাঁ, আমি ওঁনাকে গিয়ে বললাম। আমিই সে, যে আপনাকে ফোনে বলি উপনিষদ আর রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে script লিখব। আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'করব'। আমি তো থ। বললাম সত্যি করবেন? বলল হ্যাঁ। বললাম 'লিখি তাহলে'? বলল—'হ্যাঁ'।

— এখানেই পাকা চুলের মাহাত্ম্য। ফোনে তো উনি সেটা দেখতে পান নি।

— তোমাদের অঙ্ক মিস্ মৌসুমীও সে কথাই বলেছিল।

— ঠিক কথা। তারপর?

— তারপর আর কি! লিখে ফেললাম।

— শুনুন আপনি যেটা লিখেছেন, সেটা যথেষ্ট খট্‌মটে জিনিস, ওরকম বসলাম আর লিখে ফেললাম তেমন নয়।

— আরে উপনিষদ তো সেই কবে থেকেই পড়ছি। আর তাছাড়া কোন শ্লোকের সঙ্গে কোন গান দেব সেটা পেন্সিলে বইয়ের মধ্যে নাম্বারিং করেই রেখেছিলাম। ব্যাপারটাতো মাথার মধ্যে তৈরিই ছিল। দিন সাতেক সময় লেগেছিল লিখতে।

— তারপর?

— তারপর একদিন ফোন করে বললাম, লেখাটা হয়ে গেছে কবে দেব। কিভাবে দেব?

— কী বললেন উনি।

— একটু ভেবে বলল, 'আমার বাড়িতে আসতে পারবেন?' আচ্ছা বলতো এটা কোন কথা হল? শ্রীকান্ত আচার্য জিজ্ঞেস করছে আমাকে আমি ওর বাড়ি যেতে পারব কি না? কী হল তুমি হাসছ কেন?

— না এমনি।

— এমনি মানে? হাসির একটা কারণ থাকবে তো? তুমি কি ভাবছ আমি বানিয়ে বলছি?

— না, সে ক্ষমতা আপনার নেই।

— মানে?

— মানে, এতদিনে আপনাকে যতটুকু চিনেছি, just মিথ্যা কথা আপনি বলতে পারেন না। আমি হাসছি অন্য কারণে।

— সেই কারণটাই তো জানতে চাইছি।

— না, আসলে আপনি শ্রীকান্ত আচার্যের কতটা ভক্ত সেটা আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে আলোচনা হত তো তাই। যাক গে, তারপর বলুন।

— আমি বললাম ঠিকানাটা দিন, ঠিক পৌঁছে যাব। বলল ঠিকানা দিয়ে লাভ নেই। চিনতে পারবেন না, আপনি কিসে করে আসবেন? বললাম ট্যাক্সিতে, তখন বলল পিয়ারলেস হস্‌পিটাল-এর সামনে এসে আপনি আমাকে ফোন করবেন, বলে দেব।

— বোঝ! তারপর?

— বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে পিয়ারলেস হস্‌পিটালের সামনে এসে ফোন করলাম। ফোন busy, কি করি? এই কদিনে এটুকু বুঝে গেছি ও ফোনে একবার কথা শুরু করলে সহজে ছাড়ে না। উপায় নেই ট্যাক্সিটা নিয়ে এগোতে শুরু করলাম। এক সময় ২০৬ নং বাস টার্মিনাসে পৌঁছে মনে হল রাস্তাটা শেষ। সামনে একটা সরু রাস্তা গেছে বটে তবে সেটা অনেকটা পায়ে চলা পথের মতো। আর বাঁ দিকে একটা চওড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

— কী করলেন তখন?

— তখন আবার ফোন করলাম। এবার বাজল। ফোনটা ধরে কী বলল বল তো?

— কী?

— বলল। 'আপনি ফোনটা রেখে দিন। আমি আপনাকে ফোন করছি'।

— সে কি, কেন?

— জানি না। আমি অগত্যা ফোনটা কেটে দিলাম। এবার শ্রীকান্ত আচার্য নিজেই ফোন করল। করে বলে গেল—বাঁদিকের ভাঙা রাস্তাটায় ঢুকুন। ঢুকলাম, সোজা এগিয়ে আসুন। বাঁ পাশে একটা বড় পাঁচিল দেখতে পাচ্ছেন? পাচ্ছি। এগিয়ে আসুন, আসুন-আসুন এবার ডান দিকে দেখুন একটা সিমেন্টের গেট, পাশে একটা মুদির দোকান—দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ। এবার ওই গেটটা দিয়ে ঢুকে পড়ুন— সোজা আসুন ডান দিকে একটা দুটো-তিনটে রাস্তা ছেড়ে সোজা এগোন, আপনার উল্টো দিক থেকে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার cross করে বেরিয়ে গেল? হ্যাঁ। এবার আপনি ডানদিকে ঘুরুন—ব্যাস নেমে পড়ুন এসে গেছেন। ফোন

কেটে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম পৌঁছে গেছি লাল রঙের 'মেঘমুলুক'-এ। দোতালায় বারান্দায় শ্রীকান্ত আচার্য দাঁড়িয়ে।

— বোঝ! তারপর?

— তারপর আমি শ্রীকান্ত আচার্যর বাড়ির তিনতলার ঘরে বসলাম। চতুর্দিকে নানান পুরস্কার, ছবি, হারমোনিয়াম, স্বরবিতানের আলমারি ভাবতে পারছ?

— পারছি, নেহাত বয়সটা অনেকটা বেড়ে গেছে আর স্বভাবটা আমাদের মত অমানুষদের মানুষ করতে গিয়ে একটা কঠিন গাম্ভীর্যের মুখোশে ঢাকা পড়ে গেছে। নইলে—

— সত্যি! তুমি কি করে আমাকে এতটা বোঝো বল তো?

— আপনিই শিখিয়েছেন। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। তারপর কী কথা হল বলুন।

— উনি script-টা পড়লেন। বললেন সবই ঠিক আছে কিন্তু আপনার তো একজন প্রডিউসার লাগবে। বললাম, 'হ্যাঁ। ভাবনা তো রবীন্দ্রসংগীতের সবরকম'— থামিয়ে দিয়ে বলল, ''আমি ভাবনার সঙ্গে কাজ করব না। বললাম 'তাহলে ভাবনা বাদ', ও বলল 'আপনি সাগরিকার সঙ্গে কথা বলুন। কিন্তু উপনিষদের অনুবাদ অংশের পাঠ কে করবে? বললাম 'আমি তো রত্না মিত্র-র কথা ভেবেছি, আর আপনি ছাড়া একজন মহিলা কণ্ঠের গান এর জন্য শ্রাবণী সেনের কথা ভেবেছি।' বলল, 'বা! ঠিক আছে, আমাদের তিনজনের কেমিস্ট্রিটা খুব খুব ভালো। কাজ করতেও সুবিধে হয়।' বললাম, 'জানি এটা হল ত্র্যহস্পর্শ, যে কোনও অঘটন ঘটাতে পারে।'

— একমিনিট। এ কথাটার মানে তো কিছুই বুঝলাম না।

— জানতাম। তিথি বোঝ?

— সেটা কি?

— দুর্গা পুজোয় যে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এসব বল—ওগুলোই তিথি।

— সেগুলো তো দুর্গাপুজোয়?

— আরে সারা বছরই তো তিথি থাকে।

— মানে?

— অমাবস্যা-পূর্ণিমা বোঝ?

— হ্যাঁ।

— সেগুলো তো সারাবছর থাকে।

— জানি 15 days gap এ new moon আর full moon হয়।

— হ্যাঁ। অমাবস্যা আর পূর্ণিমার মাঝের 14 দিনের প্রথম হল প্রতিপদ, তারপর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এরকম করে চোদ্দতম দিন চতুর্দশী, তারপর আবার পূর্ণিমা বা অমাবস্যা।
— বুঝলাম কিন্তু ঐ যে কী কথাটা বললেন—কী স্পর্শ?
— ত্র্যহস্পর্শ—মানে একই দিনে তিনটে তিথি।
— সেটা কি করে সম্ভব?
— অনেক সময় হয়। যদিও খুব rare। হয়তো কিছুটা সময় তৃতীয়া, তারপর সারাদিন চতুর্থী আবার রাতের দিকে একটুকাল পঞ্চমী—তাকে বলে ত্র্যহস্পর্শ।
— এবার বুঝেছি।
— কী বুঝলে?
— rare and exclusive combination.
— একদম সঠিক বুঝেছ তো।
— তো শ্রীকান্ত আচার্য সেটা শুনে কি বললেন?
— কিছু বলেনি একটু হাসল। তারপর সাগরিকা company-র যে ছেলেটি এই ব্যাপারটা দেখতো তার নাম দীপাঞ্জন। ওকে ফোন করে বলে দিল আমার যাবার কথা।
— আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?
— বল।
— অনুবাদ অংশের পাঠটা আপনি করলেন না কেন?
— আমি তো বাচিক্ শিল্পী নই।
— মানে, সে আবার কি?
— যাঁরা আবৃত্তি করেন, পাঠ করেন তাদের বাচিক্ শিল্পী বলে।
— কিন্তু আপনি যখন ক্লাশে কবিতা বা গল্প পড়াতেন। তখন আপনার reading -এর মধ্যে কিন্তু বেশ একটা ব্যাপার থাকত, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আপনি পড়লেও কিন্তু ভালই হত।
— না হত না, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি basically teacher, আবৃত্তিকার নই। আমার ক্লাশে রূপসী বাংলা reading পড়া সে যত ভাব দিয়েই পড়ি না কেন, সেটা রত্না মিত্র বা ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তির মতো হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ওটা একটা আলাদা art। আর তাই ওঁরা artist।
— আর আপনি teacher, artist নন। বুঝেছি, তারপর বলুন।
— তারপর অনেক ব্যাপার, পুরো দু'বছরের গল্প। আমি তো গেলাম সাগরিকার অফিসে। দীপাঞ্জন আমার script পড়ে বলল, বোম্বে হেডঅফিস যদি approve করে তাহলে হবে।

— তারপর?

— দীপাঞ্জন আরো বলেছিল, আজকাল সিডির বাজার তো খুব খারাপ। সিডি বিক্রিতে নাকি খরচার টাকাই ওঠে না। তাই কিছু sponsorship জোগাড় করতে হবে।

— আপনি কী বললেন?

— আমি বললাম। আমি চিরকাল মাস্টারি করেছি আমি কোথায় sponsors পাব? আপনারা ব্যবসা করছেন আপনারা জোগাড় করুন।

— প্রথম দিনই বলে দিলেন কথাটা মুখের ওপর? যদি না করে দিত?

— আমি যার reference-এ গেছি তাতে point blank 'না' করতে পারবে না বুঝেছিলাম। ছেলেটির ব্যবহার ছিল খুব ভদ্র। ও শুনে বলল, আমরাও চেষ্টা করব। আপনিও দেখুন। তারপরে আমি 'আচ্ছা দেখব' বলে চলে এলাম। মাস কয়েক পরে ফোন করে বলল script approved। আপনি একদিন আসুন script-এর ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে হবে।

— মানে কোন রকম sponsorship ছাড়াই?

— হ্যাঁ। তা গেলাম, অনেকক্ষণ দীপাঞ্জনের সঙ্গে কথা হলো। কোন কোন গান কে কে গাইবে। কোন শ্লোকের পরে কোন শ্লোকটা দিলে ভালো হয়। যদি খুব বড় হয়ে যায় তো কোন শ্লোকটা বাদ দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু main কথা দুটো বলেছিল। প্রথমত, উপনিষদের শ্লোকের যে বাংলা অনুবাদটা আমি করেছিলাম তার ভাষা ছিল খুব প্রাবন্ধিক আর—

— প্রাবন্ধিক মানে?

— মানে খটমট ভাষা একটু সাহিত্যিক। সেটাকে সরল, সহজবোধ্য করতে হবে।

— আর দু নম্বর?

— আর দু নম্বরটা হল দীপাঞ্জন আমাকে পরিষ্কার বলল—শ্রীকান্তদা খুব moody মানুষ, যে কোন সময় back out করতে পারে।

— মানে?

— মানে যে কোন সময় সে বলতে পারে আমি কাজটা করব না।

— তাই?

— হ্যাঁ। এরকম নাকি আগেও বার দুয়েক করেছে। একবার নাকি একটা album-এর কিছুটা রেকর্ড করার পর back out করেছিল। সুতরাং তাকে ধরে রাখার দায়িত্ব আমার, দীপাঞ্জনের নয়।

— বোঝ! আপনি নিলেন সে দায়িত্ব?
— না নিয়ে তো আমার কোন উপায় নেই। আমি তো শ্রীকান্ত আচার্যকে দিয়ে উপনিষদ গাওয়াবার জন্যই script-টা লিখেছি।
— তারপর?
— তারপর শ্রাবণী সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম ওঁনার বাড়িতে গিয়ে script দিলাম। সুমিত্রা সেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম।
— আর রত্না মিত্র?
— ওঁনার সঙ্গে তখনই যোগাযোগ করিনি কারণ উনি যে অংশটা পাঠ করবেন সেটা তো rewrite করতে হবে।
— তারপর?
— তারপর একদিন দীপাঞ্জন ফোন করে বলল, ডিসেম্বরে 17 আর 18 তারিখ studio book হয়ে গেছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করি।
— এটা কবেকার ঘটনা?
— 2008-এর জুন-জুলাই হবে, ঠিক মনে নেই। সেটা নিয়ে কোন চাপ ছিল না, লেখার জন্য অনেক সময় ....
— আসল চাপটা তো অন্য জায়গায় সেটার ব্যবস্থা কি করেছিলেন?
— কি আর করব। মাঝে মাঝেই ফোন করতাম গানগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতাম। ঠিকঠাকই চলছিল। সেরকমই একদিন ফোন করেছি।
— কাকে শ্রীকান্ত আচার্যকে?
— হ্যাঁ। তো উনি বললেন, আমি এখন হসপিটালে আছি। আমার শ্বশুরমশায়ের bypass surgery হচ্ছে। আমি তো তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিলাম। এর দিন দশেক পর দীপাঞ্জন আমাকে ফোন করে জানাল শ্রীকান্ত আচার্যের শ্বশুর মারা গেছেন। আর শ্রাবণী সেনের অ্যাকসিডেন্টে কলার বোন ভেঙে গেছে। সুতরাং studio booking cancel. কবে হবে ঠিক নেই।
— বোঝ! এই জন্যই আপনি বলেন 'পাথর চাপা কপাল'।
— ঠিক বলি না বলো? পাথরের একদিক উঠলে অন্যদিকটা বসে যায়। বরাবর আমার ভাগ্যে এটাই হয়ে এসেছে।
— কিন্তু আপনাকে থামনো তো শিবের অসাধ্য।
— কেন বলছ একথা?
— না, স্কুলে দেখেছি তো, আপনি যখনই যেটা করতে চেয়েছেন, তখন আর সবাই

যতই আপত্তি করুক শেষ পর্যন্ত আপনি ঠিকই করিয়ে ছাড়তেন।

— যেমন?

— যেমন, আপনি যখন ঠিক করেছিলেন পূজোর ছুটিতে ক্লাস টেনের স্পেশাল ক্লাস হবে, পরীক্ষা হবে তখন তো সবাই আপত্তি করেছিল।

— হ্যাঁ স্টুডেন্টরা তো আপত্তি করবেই।

— আর টিচাররা? আপনি জানেন না, আপনাকে আমরা বলিনি, বেশিরভাগ টিচারই আপনার ওপরে রেগে গেছিলেন।

— কই আমাকে তো কেউ বলেনি।

— আপনাকে বলেননি কারণ বলতে পারেনি। আপনি যে strong logic দেখিয়ে ম্যানেজমেন্টকে রাজী করিয়েছিলেন তার ওপর আর কিছু বলা যায়? তবে আমাদের আপনি ক্রিকেট ম্যাচের লোভ না দেখালে আমরা রাজী হতাম না।

— সে আমি জানতাম।

— আচ্ছা আমাদের ম্যাচের সরঞ্জাম কে কিনেছিল?

— কেন স্কুল টাকা দিয়েছিল। তুষার কিনে এনেছিল।

— সত্যি আপনার ক্ষমতা আছে। যাকগে ছাড়ুন ওসব, তারপরে বলুন কী হল?

— হ্যাঁ ডিসেম্বরে recording cancel হয়ে গেল। তারপর ডিসেম্বরে আমি নাগপুরে গেলাম।

— হ্যাঁ, মনে আছে আপনার মা অসুস্থ হয়েছিলেন।

— হ্যাঁ, তারপর জানুয়ারি 2009, মা মারা গেলেন। কাজকর্ম মিটে গেলে ফিরে এলাম। তারপর দীপাঞ্জনকেই প্রথম ফোন করেছিলাম। happy new year বলতে। ও বলল, না দিদি new year happy নয়। বললাম কেন, বলল, 'শ্রীকান্তদা আমাকে SMS করে জানিয়েছে ''আমি মীনাক্ষীদির প্রজেক্টটা করতে পারব না।" বললাম সেকি, কারণ? বলল কারণ কিছু লেখেনি। আমার খুব খারাপ লেগেছে। তাই আমিও আর ফোন করিনি।

— ব্যাস! যেটা ভয় ছিল, সেটাই হল? তারপর আপনার কি অবস্থা?

— আমার ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভ্যাসটাতো অনেকদিনের। ফোনটা রেখে ঠাণ্ডা মাথায় একটুক্ষণ ভাবলাম কি করি। তারপর সোজা শ্রীকান্ত আচার্যকে ফোন করে বললাম, আপনার brown diary-টা দেখে একটা দিন বলবেন, আমি যাব।

— মানে সোজা এটাই বললেন। কেন করবেন না কিছু জিজ্ঞাসা না করেই?

— হ্যাঁ, উনিও কিছু না বলে দেখে আমাকে একটা দিন বললেন। গেলাম সেদিন। উনি ঘরে এলেন, বসলেন, মুখে একটু মুচকি হাসি।
— আশ্চর্য! আপনি কি বললেন?
— আমি কিছু বলিনি। উনিই প্রথম বললেন, দীপাঞ্জনের সঙ্গে কথা হয়েছে? বললাম হ্যাঁ। বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আপনার প্রোজেক্ট হবে। আমি produce করব, সাগরিকার সঙ্গে করব না।
— সে কি! শুনে আপনার কি অবস্থা? ওনার কি প্রোডাক্টশন কোম্পানি আছে?
— উনি তখন সবে 'Srikanto Achariya Production' বলে একটা কোম্পানি খুলেছিলেন।
— সেটা কি আপনি জানতেন?
— না, সেদিনই জানলাম।
— তারপর?
— তারপর অনেক কথা হল, কেন সাগরিকার সঙ্গে কাজ করবে না, এবার কিভাবে আমরা এগোব। মোদ্দা কথা, যেটা বলল সেটা হল—আমার লেখা 'উত্তরণ' is now his baby। সুতরাং তার ভালো-মন্দ সব দায়িত্ব এখন ওনার।
— এ তো আপনার জীবনের 'উত্তরণ' ঘটল বলা যায়!
— সত্যিই তাই। সেই শুরু হল কাজ। এবার রত্না মিত্রর কাছে আমার লেখাটা নিয়ে পৌঁছালাম। তারপর আমরা তিনজন একসঙ্গে একদিন শ্রাবণী সেনের বাড়িতে meet করলাম। সেদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত আচার্য একবার বলছিল শ্লোকগুলো পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীকে দিয়ে করালে হয় না?
— সর্বনাশ! তখন?
— শ্রাবণী সেন তো শুনেই বলল, 'খুব ভাল হয়'।
— ঠিকই তো, আপনার সিডির গ্ল্যামার তাহলে আরও বেড়ে যেত। আপনি শুনে কি করলেন?
— আমি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি তাহলে যাচ্ছি।
— তখন?
— তখন শ্রীকান্ত আচার্য হেসে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা বসুন। আর বলব না।
— সত্যিই নিজের ইমোশন ছেড়ে গ্ল্যামারের পেছনে ছোটার লোক যে আপনি নন, সেটা বোধহয় উনি বুঝে গেছিলেন।
— তারপর?

— তারপর একদিন আমার বাড়িতে আর বাকি কয়েকদিন রত্না মিত্রের এক ছাত্রীর বাড়িতে আমরা meet করে script-টা ঠিকঠাক হল।
— দাঁড়ান, দাঁড়ান। প্রথম দিন রত্না মিত্রও ছিলেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীকান্ত আচার্য একা।
— script ঠিক করতে?
— না দ্বিতীয় দিন সংস্কৃত শ্লোকগুলোকে উনি বলেছিলেন আমাকে একটু ভেঙে ভেঙে লিখে দিতে।
— মানে?
— মানে সংস্কৃতে দু-তিনটে শব্দ একসঙ্গে লেখা থাকে। সুরের খাতিরে তাকে ভাঙতে গেলে কোথায় ভাঙা যেতে পারে সেটা আমাকে ভেঙে লিখে দিতে বলেছিলেন। আমি সেটা লিখে দিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। তা উনি বললেন, আপনাকে যেতে হবে না, আমি গিয়ে নিয়ে আসব।
— তারপর, আপনার সেই প্রাবন্ধিক ভাষা ঠিক হল?
— হ্যাঁ। আমি মোট তিনবার লিখেছিলাম।
— কেন?
— যতবারই লিখি ততবারই বলে আরও সহজ করে, নরম ভাষায় লিখতে হবে। লোকে যাতে শোনে। তারপর রত্না মিত্রকে বললাম, আপনি পড়বেন আপনার পড়াটা স্বতঃস্ফূর্ত হবার জন্য যদি ভাষার আরও কিছু পাল্টাতে হয় নিঃসঙ্কোচে পাল্টাবেন।
— সেটা কিন্তু কেউ রাজি হয় না। আপনি হলেন কেন? লেখাটা তো আপনার।
— আমার লেখা নয়, আমার অনুবাদ।
— তবু?
— তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ আমি ভালো টিচার হতে পারি কিন্তু শ্রোতার কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে রত্না মিত্র আমার থেকে অনেক বেশি বুঝবেন। কারণ উনি বাচিক শিল্পী, সেটাই ওনার field। আমার আসল উদ্দেশ্য তো সফল। তারপর যত বেশি লোক ওটা শুনবে, ততোই তো ভাল।
— তা অবশ্য ঠিক। তারপর recording-এর গল্প বলুন।
— আমাকে শ্রীকান্ত আচার্য বলেছিল, নিজের পছন্দের studio recordist, music hands ছাড়া ও record করবে না। তাই ব্যাপারটা হতে সময় লাগতে পারে।

— আপনার আর তাতে কি?
— না আমার কিছুই না, সময় যতই লাগুক, আমি শুধু বলেছিলাম আমি প্রত্যেক দিন যাব। কাজটা কিভাবে হয় সেটা দেখব।
— কিভাবে হয়?
— প্রথমে song track তৈরি হয়।
— সেটা কি?
— গানের শুরুতে, মাঝে বা গানের সঙ্গে যে মিউজিকটা বাজে সেটা আগে রেকর্ড করা হয়। তাকেই song track বলে।
— মানে গান ছাড়া? কি করে? কোথায় হল সেটা?
— উল্টোডাঙার ওদিকে একটা studio-তে। একদিন তবলা, সরোদ আর একদিন বাঁশি, সেতার এরকম আরও কত কি।
— গান ছাড়া সেগুলো হচ্ছে কি করে?
— শ্রীকান্ত আচার্য তো গুনগুন করে সেটা করছে। আর মিউজিশিয়ানদের যেটা লিখে দিচ্ছে, তারা সেটা বাজাচ্ছে।
— তো গুনগুনটাও তো রেকর্ড হচ্ছে?
— হ্যাঁ, পরে সেখানেই আসল গানটা গাওয়া হবে। সেটা যে recordist তার কেরামতি।
— মানে ওনার পছন্দের recordist?
— হ্যাঁ, ওর নাম গৌতম। তো সেখানে তিন বা চারদিন ধরে song track record হল।
— এটা কবেকার ঘটনা?
— 2009 এর জুন-জুলাইয়ে song track হল। তারপর আবার date পেলে বাকিটা হবে এবং সেটা যে কবে হবে তার কোন ঠিক নেই।
— আপনার তো তখন বাইরে যাবার ছিল না?
— হ্যাঁ। 2009 এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-এ ছ'মাসের জন্য U.K. যাব। ক্রমশ আমার যাবার দিন এগিয়ে আসছে আর ওদিকে studio booking-এর কোন খবর নেই।
— তারপর?
— অগত্যা একদিন ওনাকে ফোন করে বললাম যে আমি ছ'মাসের জন্য বাইরে যাব।

— উনি কি বললেন?
— উনি বললেন আপনি নিশ্চিন্তে যান। আগামী ছ মাসের মধ্যে recording-এর কোন chance নেই।
— কেন?
— কারণ গৌতম ওই studio ছেড়ে উষা উত্থুপের studio তে join করেছে। সেখানকার pending কাজ। গৌতমের হাতে যে যে কাজগুলো ছিল সেগুলো সব মিলিয়ে আমরা লাইনের অনেক পেছনে।
— আর যেগুলো record করা হয়ে গেছিল? সেগুলো আবার হবে?
— না, সেগুলো গৌতম সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তাই আমি ছ'মাস না থাকলে কিছুই মিস করব না। শুধু আমার e-mail টা উনি নিয়ে নিলেন। যদি দরকার হয় তাহলে উনি e-mail করবেন।
— বোঝ! আর কত বছর ঘুরবে?
— কিছু তো করার নেই।
— এতদিন ধরে এক একটা সিডি তৈরি হয় নাকি?
— কি জানি? আমারটা তো এভাবেই হয়েছিল।
— তারপর আপনি চলে গেলেন, on line-এ যোগাযোগ হয়েছিল?
— হ্যাঁ একবার mail-এ আর একবার chat-এ।
— chat-এ!
— হ্যাঁ, আমি একদিন কম্পিউটারে on line-এ বসে কী সব করছিলাম মনে নেই। হঠাৎ দেখি তলা দিয়ে লেখাটা এল—"ভাল আছেন?"
— বাবা! তো কি কথা হল?
— এমনকি সেরকম কিছু না—আমি কোথায় ঘুরছি। ওঁনার কোন কোন function হচ্ছে, যেগুলো আমি মিস করছি এই সব আর কি।
— আর e-mail-এর বক্তব্য?
— e-mail-এর বক্তব্য রত্না মিত্র পাঠের অংশের আরও কিছু সরলীকরণ করতে চান। তো আমার তো আপত্তি কোনদিনই ছিল না।
— তারপর আসল গান কবে হল?
— আমি মার্চে ফিরলাম তারও বেশ কয়েকমাস পর।
— এই স্টুডিওটা কোথায়? কিভাবে হল সব detail-য়ে বলুন।
— উষা উত্থুপের স্টুডিও 'Vibration', ওটা Convent Road-এ।

— সে সব আমি চিনি না, চিনতেও চাই না। আপনি কাজের গল্প বলুন। ওঁনাদের কাজ করার ধরনটা কিরকম সেই গল্প বলুন।

— প্রথমে যেদিন ওখানে গেলাম, সেদিন ছিল শ্রাবণী সেনের গানের রেকর্ডিং। দু-একটা ছোট ঘটনা বলি?

— হুম, আপনার ভাষায় ছোট হলেও মনে দাগ-কাটা ঘটনা, সেগুলোই তো শুনতে চাইছি।

— স্টুডিওটায় প্রথমে একটা অফিস ঘর তারপর একটা দরজা। সেটা খুলে একটা বড hall ঘর। সেখানে মাইক, ও নানা instrument। মেঝেতে কার্পেট পাতা কিন্তু no chair, সেই hall পেরিয়ে রেকর্ডিং রুম। একপাশে একটা ছোট সোফা, মাঝে recordist আর তার পাশে মোট দুটো চেয়ার। বাকি ঘরটা পুরোটাই যন্ত্রময়। hall আর এই ঘরটার মাঝের দেওয়ালটার একপাশে একটা দরজা আর বাকিটা পুরোটাই কাচের জানলা। না, সেটা পুরোপুরি জানলা নয় কারণ সেটা খোলা যায় না।

— মানে?

— মানে দেওয়ালের বদলে কাচ। এপার ওপার দেখা যাচ্ছে। -এ আর্টিস্ট কানে হেডফোন লাগিয়ে মাইকে গান করে, কাচের ওপারে গৌতম সেটা রের্কড করে। দুজননেই দুজনকে দেখতে পায়। শুনতেও পায়, কিন্তু সেটা স্পিকারে।

— বুঝলাম, তারপর?

— শ্রাবণী সেন একটার পর একটা গান রেকর্ড করে চলেছে। প্রত্যেক বারই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'ঠিক আছে? আপনার পছন্দ হয়েছে'?

— সত্যি? পছন্দ না হলে?

— আমার যেখানটা পছন্দ হচ্ছে না সেখানটা আবার রেকর্ড করছে।

— তারপর এক সময় lunch break হল। ছেলেরা সবাই ক্যান্টিনে খেতে গেল। আমার আর শ্রাবণী সেনের খাবার অফিস ঘরে পাঠিয়ে দিল।

— কেন? এই ব্যবস্থা কে করল?

— শ্রীকান্ত আচার্য। উনি মেয়েদের ক্যান্টিনে গিয়ে খাওয়াটা বোধহয় পছন্দ করেন না।

— তারপর?

— তার পরের দিন 1st half-এ শ্রাবণী সেনের বাকি গান রেকর্ড হল। দুটো duet গান ছিল, সেগুলোও হল কিন্তু শ্রীকান্ত আচার্যের অংশগুলো বাদ দিয়ে।

— মানে সেভাবে ডুয়েট হয় নাকি?

— হল তো! যে অংশগুলো দুজনের একসাথে গাইবার কথা সেগুলোও হল। রেকর্ড করে শ্রাবণী সেন চলে গেল। সেদিন lunch-এ শ্রীকান্ত আচার্য নিজের lunch-টা অফিসে আনিয়ে নিয়েছিল just to accompany me.

— সত্যি?

— হ্যাঁ। সন্ধেবেলা রেকর্ডিং রুমের মাটিতে শতরঞ্চিতে বসে মাঝখানে খবরের কাগজের ওপরে মুড়ি-বাদাম মেখে সবাই মিলে খাওয়া হত।

— আর কি কি এরকম ছোটখাট ঘটনা আছে?

— দ্বিতীয় দিন আমি একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছিলাম। শ্রীকান্ত তখনও আসে নি। শ্রাবণী সেন এসে গেছিল। আমাকে বলল—'মীণাক্ষীদি, আপনি এই স্টুডিওর বাথরুমটা দেখেছেন? বললাম—'হ্যাঁ, কেন'? বলল 'কোলকাতার কোন স্টুডিওতে বাথরুম এরকম ঝকঝকে নয়, এ কেবল দিদির জন্য। দিদি মানে ঊষা উত্থুপ। স্টুডিওতে ওঁনার একটা অশরীরি উপস্থিতি সবসময়ে টের পাওয়া যেত।

— এত personality? আপনার সাথে দেখা হয়েছিল?

— হ্যাঁ। শেষের দিকে একদিন গৌতম বলল, দিদি রেকর্ডিং শুনে খুব excited হয়ত আসতে পারেন। তো সেদিনই বিকেলের দিকে এলেন। সবাই বাইরে উঠে গেল। আমি রেকর্ডিং রুমের ভেতরেই বসেছিলাম। হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, 'আপনি'?—আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাসলাম। এগিয়ে এসে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'এরকম সিডি কটা হয়েছে? 'you are great' তারপরেই বললেন, 'কাজ করো, কাজ করো, আমার জন্য কাজ থামিও না।

— আর আপনার সুরেলা শ্লোক কবে হল?

— তৃতীয় আর চতুর্থ দিন।

— বিস্তারিত বলুন।

— তৃতীয় দিন 1st half-এ রত্না মিত্র পাঠগুলো রের্কড করে চলে গেলেন। lunch-এর পর শুরু হল শ্লোকের রেকর্ডিং।

— আপনার কী অবস্থা?

— আমি তো প্রায় দম বন্ধ করে বসে আছি। গৌতমের ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কি একটু গুনগুন করল, তারপর গৌতমকে বলল কোন স্কেলে হবে। তারপর ওপারে hall-এ গিয়ে হেডফোন কানে দিয়ে সেই উদাত্ত গমগমে গলায় প্রথম শ্লোকটা গাইল।

— ''গাইল''? পাঠ বা মন্ত্র নয়। গান, তাই তো?
— হ্যাঁ।
— আপনার এত বছরের স্বপ্ন!
— ঠিক বলেছ। রেকর্ডিং করার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল পছন্দ হয়েছে কি না? সব জায়গায় উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না?
— আপনি তখন ঠিক ভুলের বিচারের অবস্থায় ছিলেন?
— প্রথমটা সত্যিই ছিলাম না। একটুকাল পরে ঘোরটা কাটতে অবস্থাটা ফিরে পেলাম।
— ভুল ছিল?
— ঠিক ভুল নয়, সংস্কৃত উচ্চারণের কিছু কিছু বিশিষ্টতা থাকে। সেইরকম দু-একটা জায়গা একটু পাল্টে পারফেক্ট করতে বলেছিলাম।
— আচ্ছা একটা কথা, আপনার সিডিটা আমি কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনেছি। শ্লোকগুলো তো একক কণ্ঠে নয়, একাধিক voice-এ হয়েছে মনে হয়।
— না, কণ্ঠ একটাই, তিনটে স্কেলে তিনবার রেকর্ড করে একটা track-এ বসানো হয়েছে।
— ও, উনি নিজেই এক-একটা শ্লোককে তিনবার তিনটে স্কেলে গেয়েছেন?
— হ্যাঁ।
— তারপর অন্য গুলো?
— একটার পর একটা শ্লোক এভাবেই করে গেল।
— ঐ ভাবে মানে, গৌতমের ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কি একটু গুনগুন করে, তারপরে hall-এ গিয়ে সেই উদাত্ত গমগমে গলায় গানের মতো?
— তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছ?
— আরে ইয়ার্কি মারব কেন? আপনি কি আমার ইয়ার? আপনি তো আমার teacher!
— তবে ?
— তবে কিছু না, যে কোন excitement সঠিকভাবে বোঝাতে গেলে repeatation লাগে। তাই আপনার কথাটাই repeat করলাম। তো একই দিনে সবকটা শ্লোক হল? আটটা আছে না?
— হ্যাঁ, সাতটা হল সেদিন। পরের দিন সকালে আট নম্বরটা।
— আট নম্বরটা কিন্তু 'একঘর'।
— ওটার শুরুর মিউজিকটা তৈরি করে নিজেই গৌতমকে বলছে এ তো 20th century fox হয়ে গেল।

— সত্যিই তাই, আর ওটা last-এ দিয়ে খুব ভাল হয়েছে। মানে বাংলা অনুবাদটা ওটার আগে দেওয়াটা ঠিক হয়েছে।
— এটা রত্না মিত্রর আইডিয়া। উনি পরের দিন একবার এসেছিলেন, ওঁনার পাঠের একটা অংশ আর একবার রেকর্ড করতে।
— মানে হয়ে যাওয়া রেকর্ড আবার করতে! কেন?
— ওঁনার পরে মনে হয়েছিল কোন একটা জায়গা ঠিক যেভাবে বললে সবচেয়ে ভাল হয় সেরকম হয়নি।
— বাবা! উনি তো আপনার থেকেও বেশি খুঁতখুঁতে।
— এঁরা সবাই আমার থেকে শতগুণে বেশি perfectionist, আর তেমনি হল গৌতম। কি সাংঘাতিক কান। শেষ গানটা chorus! ওটা গেয়েছিল শ্রাবণী সেনের স্টুডেন্টরা। ওটা রেকর্ডের সময় একটা লাইনের একটা শব্দ কোন একজন ছেলের উচ্চারণটা ঠিক হচ্ছিল না—আমাদের কারুর কানে ধরা পড়েনি। গৌতম ধরেছিল, তারপর সবাইকে আলাদা আলাদা করে গাইয়ে যার ভুল তারটা ঠিক করে আবার রেকর্ড হল।
— আর অন্যরাও খুঁতখুঁতে?
— সবাই। রেকর্ড করার পরে তো সেটা আমরা সবাই শুনেছি, যার যেখানটা মনে হচ্ছে আর একবার করলে আরও ভাল হবে। সেখানটা আবার করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে গৌতম তো বটেই আমিও যতবার বলছি ততবার করছে। কোন ক্লান্তি নেই।
— হ্যাঁ, তা শেষ শ্লোকটা last-এ দেওয়া কি ভাবে হল?
— হ্যাঁ, সেদিন রত্না মিত্র যখন এলেন বিকেলের দিকে ওঁনাকে শ্লোকগুলো শোনানো হল। উনি শুনে বললেন, এই শেষ শ্লোকটা দিয়েই সিডিটা শেষ হবে, আর তার অনুবাদের অংশটা উনি আবার নতুন করে সম্পূর্ণ অন্যভাবে রেকর্ড করলেন। উনিই ঠিক করলেন শেষে আগে গান, তারপর অনুবাদ, তারপর শ্লোক থাকবে।
— তারপর?
— তারপর পুরোটা রেকর্ড হবার পর আমাদের সবাইকে একটা করে rough copy দিয়ে শ্রীকান্ত আমাদের বলে দিল, আমরা যেন ওটা মন দিয়ে বারবার শুনি, তারপর কোথায় কোনটা বদলাতে হবে সেটা নোট করি। মাস দুয়েক পরে আবার একদিন স্টুডিয়োতে গিয়ে যে যে যেখানটা বলেছে সেই অনুযায়ী আবার রেকর্ড হল।
— আপনিও বলেছিলেন বদলানোর কথা?

— হ্যাঁ পাঠ বা গানের ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি। কারণ ওঁনারা সেগুলো আমার থেকে ভাল বুঝবেন। 6 নং শ্লোকের শুরুটা আমার ভাল লাগেনি সেটা বলেছিলাম।
— সেটা আবার হল?
— হ্যাঁ, একদম অন্য রকম সুর করে হল। এরা কিরকম জান তো? ''বজ্রে তোমার বাজে''— গানটার মুখরাটা?
— এই রে, 'মুখরা' কী?
— মুখরা হল গানটা শুরু হবার আগে যে মিউজিকটা হয়।
— ও।
— তো সেটা তবলা দিয়ে করা হয়েছিল প্রথমে। পরে সেটা ভাল না লাগায় সম্পূর্ণ অন্য instrument দিয়ে নতুন করে রেকর্ড করা হল। বাকি অংশটা আগেরটাই রইল। তারপর আরও দুটো গানে দুটো অংশে একটুখানি সরোদ আর বেহালা দেবার কথা মনে হল। আবার সেই দুজনকে দু-দিন ডেকে সেটুকু করালো।
— সত্যি! dedication না থাকলে কি আর বড় আর্টিস্ট হওয়া যায়?
— কি রকম dedication জান? সিডিটা যখন হয়ে final এসেছে, রত্না মিত্র'র একটা অপারেশন হয়েছিল। উনি অসুস্থ ছিলেন, last যেদিন আমি স্টুডিয়োয় গেছি। গিয়ে শুনলাম উনি আসবেন। আমি তো অবাক, কেন? না কোন একটা শব্দর উচ্চারণ ওঁনার পছন্দ হয়নি। সেটা আবার রেকর্ড করাবেন।
— বোঝ? আর শ্রীকান্ত আচার্য? উনিও?
— ওর কথা কি বলব বল তো? কি পরিশ্রম আর dedication নিয়ে যে কাজটা করেছেন, আমার কিছু বলার নেই।
— সেই dedication এরই result আপনার ''উত্তরণ''-এর "Radio Mirchi"-র best রবীন্দ্রসঙ্গীত অ্যালবামের পুরস্কার। স্টার জলসায় আমি কিন্তু পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটা দেখেছিলাম। আপনি তখন আবার U.K. চলে গেছেন। ওঁনারা আপনার কথা অনেক বার করে বলেছিলেন। আমি কিন্তু ঐ rough সিডিটা শুনব। তবে হয়ত ওঁনাদের dedication-এর কিছুটা আন্দাজ করতে পারব।
— সে না হয় শুনো। আমার সবচেয়ে ভাল লাগাটা কি জান? এতবছর ধরে কাজটা হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত 2011 সালের গানমেলাতে ওটা করা গেল। যে বছর রবীন্দ্রনাথের 150 বছর। এটা কেন হল বল তো?
— আমার মনে হয় আপনার কপালের ওপরে যে পাথরটা চাপা থাকে, তারই এক ফাঁক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ গলে ঢুকে গেছিল।

দেড়শো বছরের অন্ধকারে : মেঘনাদবধকাব্য

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্মবর্ষ 1824 খ্রিস্টাব্দে। মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল একত্রে 1861। অর্থাৎ মধুসূদনের বয়েস তখন 37। তারও আগে 1859 থেকে 1860 এই দু'বছরে তাঁর পাঁচটি নাটক ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনাদবধকাব্যের প্রকাশকাল ধরে বঙ্গবাসী যে সেই গ্রন্থপ্রকাশের দেড়শো বছর পালনে তৎপর হয়ে উঠলেন, এটা ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানানো। মধুসূদনের জন্মশতবর্ষকে শিক্ষিত বঙ্গজন অবশ্যই বিস্মৃত হননি। তবে সেই সময়টি কপোতাক্ষ-তীরবাসী আমি, আমার জন্মের প্রায় কানঘেঁসে চলে গেছে। আমার সাক্ষাৎ স্মৃতি তো বাতুলতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের যখন জন্ম, তার বারো বছর পরে মধুসূদনের জীবনাবসান। স্মৃতিধর রবীন্দ্রনাথের মন থেকে মধুসূদন কখনো বিস্মৃত হননি; 1929 (1935 বঙ্গাব্দ) এ লেখা 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ''আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপর গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়, পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।''

আমাদের আজকের আলোচনা মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে। মধুসূদনের উচ্চাশা, বিলেত গিয়ে ইংরিজি কবিতা লিখে ইংরেজ কবিদের মতো খ্যাতিমান হবেন, এ-সাধ তাঁর অপূর্ণ থেকে গেছে। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ গিয়ে তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতায় যুক্ত হলেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য পিতা রাজনারায়ণ তাঁর একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। মাদ্রাজে Timothy Penpoem ছদ্মনামে নানা কাগজে কবিতা লিখে কিছু অর্থোপার্জন করেছেন, তাঁর উচ্চ জীবনযাত্রার বিলাসী স্বপ্নকে পুষ্ট করার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। একাধিক বিবাহ, 1851-তে তাঁর মায়ের মৃত্যু 1855 সালে পিতার মৃত্যু, তাঁর আকাশচুম্বি স্বপ্নের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত। এই বৈপরীত্যের মধ্যেই মধুসূদন পরপর লিখে চলেছেন শর্মিষ্ঠা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি।

মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে যত সমালোচনা হয়েছে, মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র চিত্রনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ততো আলোচনা হয়নি। অমিত্রাক্ষরের সপক্ষে মধুসূদন নিজেই বলেছেন, মিত্রাক্ষর যেন বাগদেবীর চরণে নিগড়। মধুসূদনের সময়ের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন মধুসূদনের কবিতা ত্রুটিমুক্ত নয়। তথাপি তিনি বলেছেন মেঘনাদবধ কাব্য মধুসূদনের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন ''স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই... । এই সকল নামের সহিত মধুসূদনের নামেও বঙ্গদেশ ধন্য হইল।... কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'। তবু বিতর্ক ও বিদ্রূপের শেষ ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন—

'কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।'

জগবন্ধু ভদ্র লিখলেন 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য'। মধুসূদনের একনিষ্ঠ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মধুসূদন সৃষ্ট সীতাকে বললেন—উন্মাদ রোগগ্রস্ত। রামচরিত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব ফুটে উঠেছে নানা দৃশ্যে। দেবঅস্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্মণ-বিভীষণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করছে। লঙ্কাপুরীর শত্রুর সঙ্গে বিভীষণের এই ষড়যন্ত্র, সে তো তার নিজের রাজসিংহাসন হারাবার আশঙ্কায়।

এ-যুগের কবি বুদ্ধদেব বসু-ও বলেছেন মধুসূদনের কবিতায় যত ভাষার দৌরাত্ম্য, তত ভাবের দৌত্য নেই।

বাল্মিকী রামায়ণের চরিত্র বিন্যাসকে মধুসূদন যে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন নি, তার দৃষ্টান্ত তিনি গ্রীক মহাকাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রাক্কালে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়েছিলেন। ''আমি এখন 'সিংহল বিজয়' মহাকাব্য লেখার কথা ভাবছি না। আমি আমার প্রিয় বীর ইন্দ্রজিতের অসহায় মৃত্যুদৃশ্য রচনায় মগ্ন। সেই দৃশ্য বর্ণনায় আমাকে অনেক অশ্রুপাত করতে হয়েছে। একজন খ্রিষ্টান যুবক হিসেবে হিন্দুধর্ম নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আমি মেঘনাদবধ কাব্যে গ্রীক পুরাণের মাধুর্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই। সেখানে বাল্মিকীর কাছ থেকেও আমার কিছু গ্রহণ করবার নেই। আমার হৃদয়ে মেঘনাদ এক উজ্জ্বল কবিতা হয়ে উঠেছে।" মধুসূদন স্বীকার করেছেন যে তিনি ইউরোপিয় কাব্যসাহিত্যের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন। কে 'মেঘনাদবধ'-কে বিদ্রূপ করে 'ছুচ্ছুন্দরীবধ' কাব্য লিখল তাতে মধুসূদন বিন্দুমাত্র বিড়ম্বিত নন।

।। দুই ।।

মধুসূদনের বিদেশযাত্রা, ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় ফিরে আসা, জীবিকার্জনে অসাফল্য; এই সব বৈপরীত্যের মধ্যেই মেঘনাদবধ কাব্যের সৃষ্টি। কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' এক অসাধারণ সংবর্ধনা জানালেন 12 ফেব্রুয়ারি 1861। মানপত্রে লেখা হয়েছিল 'আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমনকি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবি আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।'

মধুসূদনের নয়, সার্ধশতবর্ষ মেঘনাদবধ কাব্যের। তাহলে কবিতায় অমিত্রাক্ষরকে প্রতিষ্ঠা দেয়া ছাড়া মেঘনাদ কাব্যের আর কি কোনো চারিত্রিক ও সামাজিক 'বৈশিষ্ট্য নেই! মেঘনাদবধ কাব্যের বীর নায়ক ইন্দ্রজিৎ, খলনায়ক বিভীষণ; পলাশী যুদ্ধে যেমন সিরাজ ও মীরজাফর। দশেরা-য় অত্যাচারী রাবণের বিশাল মূর্তিকে ঘটা সহকারে দাহ করা হয়। রামায়ণের রাম রাবণ মেঘনাদ বিভীষণ সবাই পৌরাণিক চরিত্র। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদ দৈব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ। জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণের ষড়যন্ত্রে তাকে নিহত হতে হল যজ্ঞশালায়। মধুসূদন মেঘনাদকে স্বদেশপ্রেমী বীরের সম্মান দিয়েছেন।

।। তিন ।।

1861-তে প্রথম প্রকাশের পর এই দেড়শো বছর মেঘনাদবধ কাব্যের অসংখ্য সংস্করণ হলেও তার প্রভাব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙিয়ে সাধারণ জনমনে ছায়া ফেলেনি। সার্ধশতবর্ষের উৎসবে বঙ্গীয় সুধী সমাজের মনে বাসব বিজয়ী বিদ্রোহী মেঘনাদের স্থান কোথায়! মধুসূদনের অভিমানী কণ্ঠস্বরে আজ মেঘনাদ যদি বলে ওঠেন—

'রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে'

তাহলে কোন অন্ধকারে অকৃতজ্ঞ বঙ্গবাসী মুখ লুকাবে!

আনপড়ের ডায়েরি

অর্ঘ্য দত্ত

(দ্বিতীয় কিস্তি)

ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় 1939 খ্রিস্টাব্দে 6-7 বছর বয়স অব্দি ঢাকায় ছিলাম—উয়ারিতে। আমাদের বলা হতো উয়ারির মানুষ-বাঁদর।

আমাদের বাসার সামনের রাস্তার উল্টো দিকে পারিবারিক বন্ধু অধ্যাপক প্রতুল সেন-এর বাসা। আমার বাবাও অধ্যাপক। দু'জনে খুব বন্ধু। প্রতুল কাকার এক মেয়ে গীতা আমার বয়েসী—জমিদার জমিদার ভাব—আমার পুতুল খেলার বন্ধু, খেলা আরম্ভ করার শুরুতেই বলতো, আজ তুমি দারোয়ান। আমার খুব রাগ হতো কিন্তু খেলা ছেড়ে চলে যেতাম না। ছোটবেলা থেকেই কাউকে কষ্ট দিতে চাইতাম না। আমাদের বাসারই একতলার বারান্দায় খেলতাম। মাঝে মাঝে আমাদের বাসা থেকে অল্প দূরে বড়মাসীদের বাসাতে খেলতে যেতাম—ওদের বাসার সামনেও, আমাদের বাসার মতোই, অনেকটা খেলার জায়গা। পুরো অঞ্চলটাতেই শান্ত পরিবেশ, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া কম।

বাবা পোলিওতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। ঠিক হয় আমরা ঢাকা ছেড়ে আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে চলে যাবো। Comilla was famous for Banks and tanks. আমাদের কুমিল্লার বাড়ি ছিল বিশাল—সাড়ে সাত বিঘা জমির ওপর একটা প্রাসাদের মতো দোতলা বাড়ি—একএক তলায় চারটে করে বিশাল ঘর—একটা পঁচিশ বাই পনেরো, বাকি তিনটে পনেরো বাই পনেরো। তাছাড়া দু'টো প্রশস্ত বারান্দা। পেছনদিকে দুই বিঘার পুকুর। আর পুকুর কাটা মাটি দিয়ে একটা টিলা—যাতে বাড়িতেই পিকনিক করা যায়। বাড়িতে প্ল্যান করে লাগানো হয়েছিল নানান রকম গাছ—আমলকি, হরতকি, বহেরা, আম, জাম, কাঁঠাল, বাতাবি, বেল, কদবেল, নারকেল এমনকি গোলাপজাম!

পুকুরপাড়ে বাবা একটা কুঁড়েঘর করে দিয়েছিল—মেজদার (অম্লান দত্ত) নিরিবিলিতে পড়াশুনো করার জন্য। দিদিও (গীতি) স্কুলে (ফইজন্নেসা গার্লস স্কুল) বার্ষিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবার জন্য তৈরি হত ওই কুঁড়েঘরে প্রাণপণ চেঁচিয়ে আবৃত্তি practice করে;

কুঁড়ে ঘরের চার দিকে কাছাকাছি কারো বাড়ি ছিলনা। বাবা পরে সাড়ে সাত বিঘা জমির পরও, পেছন দিকে boundary-র সঙ্গে লাগোয়া এক বিঘা ও দু'টো পাঁচ কাঠা ধানী জমি কিনেছিলেন।

সবই তো হল কিন্তু আমার মনে কি অশান্তি, কি অশান্তি! আমরা সবাই জানতাম বাবা খুব সৎ ছিল। কিন্তু super brilliant বড়দাকে (অনিল দত্ত) বিলেতে পড়াবার জন্য সে যুগে মাসে মাসে সাতশ টাকা করে পাঠাতে হয়েছিল কয়েক বছর। তাহলে? বাবাতো চুয়াল্লিশ বছর বয়েসে Polio-তে চলৎশক্তিহীন হয়ে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-এর চাকরি ছেড়ে দেন। বড়দার জন্য যে টাকা পাঠানো হতো মাসে মাসে সেটা আজকের হিসেবে বিশাল টাকা—তারপরেও এতো পেল্লাই বাড়ি!

বাবা সুস্থ থাকার সময় বন্ধুর মতো ছিলাম, যতো দিন সচল ছিল বাড়িতে বইতো আনন্দের হাওয়া। কিন্তু পঙ্গু হয়ে পড়ার পর ক্রমশ বাবার সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যেতে থাকে। বাড়ির পরিবেশ তখন নিরানন্দ।

তাহলে বাবা কি করে এতো বড় সম্পত্তি করলো? ভাবতেই থাকলাম। ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো বাবার লেখা স্কুল পাঠ্য একটা বই—'ভূগোল বিকাশ'-এর তখন অখণ্ড বাংলায় ও আসামে প্রচন্ড চাহিদা ছিল। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই বই বিক্রির জন্য বছরে maximum কতো royalty পেয়েছো? বাবা বলল দশ হাজার টাকা। আঃ, অঙ্ক মিলে গেলো। এ টাকা আজকের হিসেবে তো fabulous! তার সঙ্গে অবদান ছিল আমার অসাধারণ মা—সুনীতিবালার মতো Home cum Finance Minister-এর কৃচ্ছসাধনের magic !

*

দাদুরা ও আমরা মিলে তখন কুমিল্লায় অনেক আত্মীয়স্বজন। একবার ঠিক হয় আমাদেরই কুশীলব করে 'সাত বামনের কান্ড' নামে একটা নাটিকা মঞ্চস্থ করা হবে—একবার দাদুর বাড়ি, আর আরেকবার (বাবা হাঁটতে পারেনা বলে) আমাদের বাড়িতে।

দাদুর বাড়ির শো-তে আমি massacre করলাম। দৃশ্যটা হচ্ছে রাজকন্যা ঘুমুচ্ছে আর সেই সময় সাত বামন রাজকন্যার মাথার কাছে রাখা মিষ্টির থালার ঢাকা সরিয়ে কাড়াকাড়ি করে মিষ্টি সাবাড় করছে। আমি তখন সবথেকে ছোট বলে কাড়াকাড়িতে হেরে গিয়ে কোনো মিষ্টিই পেলাম না। তখন রেগে গিয়ে 'ঘুমন্ত' রাজকন্যার চুল ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে দিলাম, তাড়াতাড়ি screen ফেলে দেওয়া হলো। বড়রা অন্য বাচ্চাদের বকাঝকা করে আমাকে শান্ত করল। বলা হল, আমাদের বাড়িতে যখন repeat show

হবে আমার জন্য মিষ্টি আলাদা করা থাকবে। আমি যেন রাজকন্যার চুল ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে না দিই।

আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে আমার এক মাসি—নিয়তি, কিছুদিন ছিল। ভীষণ গায়ের জোর। আমাদের বাড়ির পাশের কর বাবুদের বাড়িও বিরাট জমি নিয়ে। আমাদের বাড়ির সীমানা সংলগ্ন কর বাবুদের জমিতে একটা ল্যাংড়া আমগাছ ছিল, বাবা এক season-এর জন্য ভাড়া নিয়েছিল। আমি আর নিয়তি মাসি দোতলায় ঘুমুচ্ছি—খুব ভোরবেলা তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি—হঠাৎ ধপ্ ধপ্ করে কয়েকবার আওয়াজ হল। মাসি আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, 'ছন্দ চল্, ল্যাংড়া গাছের আম পড়ছে বোধহয়, ধপ্ ধপ্ করে আওয়াজ হলো। দেরি করলে বাইরের লোক কেউ নিয়ে যাবে'। আমি ঝট্‌পট্ তৈরি হয়ে একটা ব্যাগ নিয়ে মাসিকে অনুসরণ করলাম সত্যি সত্যি কয়েকটা আম পড়েছিল। সে ছিল এক আনন্দের দিন-কাল।

*

দাদুর বাড়ির এক বিবাহোৎসবের সময় আমাদের দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর ছিল মূল বাড়ি থেকে খানিক দূরে। ভাঁড়ার ঘরে সব লোভনীয় খাবার, বিশেষ করে নারকেলের চিঁড়ে ইত্যাদি থাকতো তালা বন্ধ হয়ে। সেসব তালা দামি তালা নয়, লোহার হাল্কা রড্ ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করলে খুলে যেতো। আমরা ত্রিমূর্তি (আমি, আমার দাদা মুকুট ও মাসতুতো দাদা ঝুনু—সবাই বছর তিনেকের ছোট বড়) একটা বড় পেরেক দিয়ে ভাঁড়ার ঘরের তালাটায় ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করতেই তালা খুলে গেল। আলমারি থেকে সুস্বাদু খাবার সব সাবাড় করে কোনমতে তালাটা বন্ধ করে বিয়ের উৎসবে মেতে গেলাম। কেউ বুঝতে পারেনি।

*

শহর থেকে কিছু দূরে ময়নামতি নামে একটা চমৎকার বেড়াবার জায়গা তথা picnic spot ছিল—ছোট বড় অনেক টিলা। এসব এখন বাংলাদেশের বিখ্যাত জায়গা। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন বৌদ্ধসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে; তাছাড়া বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনীর বড়ো ছাউনিও আছে সেখানে।

আমি কুমিল্লা জিলা স্কুলে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হই। ক্লাস টিচার ছিলেন মাখন দত্তগুপ্ত। একজন অসাধারণ শিক্ষক ও আর্টিস্ট। উনি আমাদের নদী, শাখানদী, উপনদী যেভাবে শিখিয়েছিলেন (তখন তো এখনকার মতো teaching aids বা নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

ছিল না) সেটা কখনও ভুলবো না। স্কুলের ক্লাস ঘরগুলো পরপর এক সারিতে—সামনে প্রশস্ত বারান্দা। উনি এক বালতি জল ও একটা মগ আনালেন। এবার সবাইকে ক্লাস ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে বললেন। এবার মগ করে জল ঢাললেন বারান্দার ক্লাস ঘরের দিক থেকে—জল বারান্দা বেয়ে বাইরে চলে গেল। এরপর ধার থেকে এমনভাবে জল ঢাললেন যাতে সে জল মূল ধারায় (নদীর) সঙ্গে এসে মেশে—এটা হল উপনদী। এবার মূল ধারার নদীতে এমন ভাবে জল ঢাললেন যাতে কিছু জল মূল নদী থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে চলে—এটা হল শাখানদী। এই পুরো ব্যাপারটা পরে ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে বুঝিয়ে দিলেন। আর কি কখনও এই ছবি মন থেকে হারিয়ে যেতে পারে!

আগেই বলেছি, তখন এতো teaching aids ও নানা রকমের যন্ত্রপাতি ছিল না ছাত্রদের সুবিধের জন্য, কিন্তু innovative শিক্ষকরা নানা পথ বের করতেন ছাত্রদের সুবিধের জন্য। এখানে আমার মা সুনীতিবালার innovative শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা বলা যায়। মা-র তো অনেক ছেলে-পুলে—এদিকে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য তরকারি কাটা, রান্না সবই করতে হতো। তরিতরকারি কাটার সময় পাশে বসা ছেলে মেয়েদের তরকারির টুকরোগুলোকে teaching aids এর মতো ব্যবহার করে অক্ষর শেখাতেন। বাবা B.T. College-য়ে পড়াতেন, উনি মা-র সম্বন্ধে বলতেন, teaching aids তো তখনও চালু হয়নি, মা ম্যাট্রিক পাশ হয়ে এতো innovative কি করে হলেন, বিস্ময়কর!

ক্লাস ফোরে উঠে ভর্তি হই বিরাট প্রাইভেট স্কুলে। নাম ঈশ্বর পাঠশালা। মেজদা অম্লান দত্ত এই স্কুল থেকেই স্ট্যান্ড করে ম্যাট্রিক পাশ করে। এই বিশাল স্কুল ও রামমালা নামের ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন মহেশ ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোক, যিনি জীবন শুরু করেন শিশি বোতল কেনা-বেচা করে। উনি কুমিল্লায় ঈশ্বর পাঠশালা, নিবেদিতার নামে মেয়েদের স্কুল, ছাত্রাবাস এবং পরে কলকাতায় M. Bhattacharya Homoeo Pharmacy দোকান ও ফ্যাক্টরি এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করেন। কলকাতা পৌরসভা উত্তর কলকাতায় হেদুয়া (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ)-র কাছে রায় বাগান স্ট্রীটের নাম বদলে করেন মহেশ ভট্টাচার্য সরণি।

কুমিল্লার টাউন হলে একবার কোনো উপলক্ষে মেজদা অম্লান একটা public speech দেয়। ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচরেরা এতে দেশদ্রোহিতার (পড়ুন ব্রিটিশ সরকার দ্রোহিতার) আঁচ পেয়ে ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক জানকীনাথ সরকারকে বলে, আপনার ছাত্রকে সাবধান করে দেবেন—বাচ্চা ছেলে বলে আমরা কিছু বললাম না। জানকী বাবু এ বিষয়ে বাবাকে বলতে এলে, বাবা জানকীবাবুকেই বকে দেন এই বলে যে, 'অম্লান আপনার ছাত্র। কিছু বলতে হলে আপনি ওকে বলবেন। আমি ওর বক্তব্যে কিছু অন্যায্য কথা আছে বলে মনে করিনা। তাছাড়া ওর স্বাধীন চিন্তায় আমি হস্তক্ষেপ করাটাও উচিত বলে মনে করিনা।

বড় হয়ে কলকাতায় এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় বামপন্থী নেতারা দাদাকে আমেরিকার চর বলে প্রচার করতেন। এক সময় আমেরিকায় ম্যাকার্থি বলে এক রাজনৈতিক নেতার কম্যুনিস্ট বিরোধিতা এতোটাই উগ্ররূপ নেয় যে, তিনি সারা আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান যে, সব গ্রন্থাগার থেকে কম্যুনিজমকে সমর্থন করে এমন সব বই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই সময় Amrita Bazar Partika-র Editorial page-য়ে বড় একটা প্রবন্ধ লেখে মেজদা "The Book Burning Democracy" নামে। এই সময় মেজদা আমেরিকায় যাবার জন্য একটা Scholarship পায়। কিন্তু তখনকার কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর দাদার Scholarship cancel করে দেন এই অজুহাতে যে অম্লান দত্ত কম্যুনিস্ট। ওঁর জায়গায় কবীর সাহেবের পরিচিত একজন scholarship-টি পায়।

সঞ্জয় গান্ধী যখন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রচন্ড শক্তিশালী, তখন তিনি দেবকান্ত বরুয়া (যিনি Indira is India এই slogan-টা চালু করেছিলেন) এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে দায়িত্ব দেন মেজদাকে বিত্তমন্ত্রী বা শিক্ষা মন্ত্রী হতে রাজি করাতে। তাঁরা এসে দাদাকে বলে সঞ্জয় গান্ধী চান তিনি কেন্দ্রে মন্ত্রী হন। মেজদা বলেন, তিনি মন্ত্রী হতে চান না। তাঁরা তবু insist করতে থাকলে অম্লান দত্ত তার সেই বিখ্যাত চিবিয়ে চিবিয়ে—politics is not my cup of tea বাক্যটা বলে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। অগত্যা তাঁরা গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীকে report করলেন। সঞ্জয় গান্ধী Income Tax ডিপার্টমেন্টকে মেজদার I. T. Return check করতে বললেন। দাদার I.Tax Return এতো স্বচ্ছ ছিল যে কিছুই করা যায়নি।

আরেকটা গল্প শোনা, তখনকার NCERT-র কর্মী তথা প্রয়োজনে govt. function-এর volunteer, প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে। তখন সবে Emergency declared হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ডেকেছেন এই ভরসায় যে তাঁরা তাঁর ED কে সমর্থন জানাবেন। একেকজন উপাচার্য আসছেন আর আপৎকালীন আইন প্রণয়ন (ED)-কে সমর্থন জানাচ্ছেন। অনেকের যখন বলা হয়ে গেছে তখন ইন্দিরা বললেন, আমি এবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অম্লান দত্তকে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বিজ্ঞান ভবন তখন নিস্তব্ধ। অম্লান দত্ত ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন এবং ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মুক্ত চিন্তার ধারক ও বাহক হবে এটাই দেশ আশা করে। কিন্তু যখন দেখলাম একজনও আপৎকালীন আইন প্রবর্তন-এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেন না—তখন আশংকা হবার কারণ আছে যে মুক্ত চিন্তা প্রকাশ করার পরিবেশ নষ্ট হতে চলেছে। এই আশংকা নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি। ইন্দিরা গান্ধী ও হলের সবাই স্তব্ধ। তারপর আরো দু'য়েকজন উপাচার্য বলার পর ইন্দিরা গান্ধী উঠে চলে গেলেন।

অম্লান দত্তের বিষয়ে এমন অনেক গল্পের মধ্যে আর মাত্র একটা গল্প বলবো। অম্লান দত্ত তখন বিশ্বভারতীয় উপাচার্য। বিশ্বভারতীর কর্মচারীরা মনে করছেন বেতনের তারতম্যটা মাত্রাধিক, এটা পাল্টানো উচিত। এই দাবি পেশ করলে অম্লান আলোচনার জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করলেন। নির্দিষ্ট দিনক্ষণে উপাচার্য একটা busket হাতে করে এলেন—কর্মীরাও সবাই উপস্থিত। অম্লান বললেন—বেতনের তারতম্য খুব বেশি এটা মনে করা অযৌক্তিক নয়, তবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এর বেতন বৈষম্য এখানকার কেউ বদলাতে পারে না। তবে আমি একটা পথ ভেবেছি যাতে আইন ভঙ্গ হবে না, কিন্তু আবার অন্যায্য বৈষম্যও দূর হবে। আমরা সবাই যে মাইনে পেয়েছি তা এই বাস্কেটে রাখবো তারপর সবাই মিলে স্থির করবো ন্যায্য বেতন কি হওয়া উচিত—আমরা সেভাবেই টাকাটা বেটে নেবো। এই আমি এ মাসের মাইনেটা এই বাস্কেটে রাখলাম। আপনারাও যার যারটা রাখুন, তারপর সর্বসম্মতিক্রমে যা করার করা যাবে। তারপর কর্মচারীরা একটু একটু করে সবাই চলে গেলেন, এই বলে যে, যা আছে তাই থাকুক।

*

এদিকে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে জাপানী বোমা পড়েছে। ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মায়ানমার) জাপানী সেনা ঢুকে পড়েছে—চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ইত্যাদি শহর থেকে অনেকেই গ্রামে চলে যাচ্ছে। আমরাও চলে যাই শ্রীহট্টে (সিলেট) দাদু রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র দত্তের গ্রাম জগদীশপুরের বাড়িতে।

আমরা দেরি করিনি কারণ জাপানী army পাশের দেশ মায়ানমারে ঢুকে পড়েছে, আরো এগোলে শহর ছাড়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গেলে চলৎশক্তিরহিত বাবার পক্ষে যাওয়া মুশকিল হবে।

ইতিমধ্যে আমার মজার ডাক্তার-মেসো মণিশঙ্কর দত্ত-রাও চলে এসেছে গ্রামে। এই মেসোর চলাফেরা কথাবার্তায় একটা কমিক ভাব ছিল। সেই ছোটো বয়েসে আমাদের খুব আনন্দে দিন কেটেছে—পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরেছি; বাতাবি লেবু (আমরা বলতাম জাম্বুরা) দিয়ে ফুটবল খেলেছি। একদিন মেজো মেসো বাজার থেকে একটা পাঁঠা কিনে এনেছে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে, লেফট্ রাইট্ বলতে বলতে। মেসো পরে আর্মিতে ডাক্তার হিসেবে যোগ দেয়।

জগদীশপুর গ্রামের সবাই পরস্পরের আত্মীয়, তাই এই গ্রামের সব বাড়িই আমার কাছে মামার বাড়ি। সব বাড়িতেই আমি স্বাগত। কিন্তু এই আনন্দের দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমরা গ্রামে এসেছিলাম, যুদ্ধ থেমে গেলে আবার কুমিল্লায় ফিরে যেতে পারবো ভেবে। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে আমাদের বাড়ি requisition করে নেয়, ব্রিটিশ আর্মি। তখন বাবা ঠিক করলো কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থাকব। কাজেই বিদায় জগদীশপুর, বিদায় কুমিল্লা।

ক্রমশ...

মণিলাল ভৌমিক

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

শিরোনামে থাকা আমার সহপাঠীর কথায় আসার আগে একটু গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন। আমার অসীম ভাগ্য যে, আমার জীবনে আমি বহু বড় মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি। ছাত্রজীবনেও অনেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিভা দেখেছি।

আমি ছাত্রজীবন পেরিয়ে এসেছি 60/70 বছর আগে। আদি অনন্ত কালের তুলনায় এই সময় নিতান্তই নগণ্য। আমাদের স্কুল জীবনে ভারত পরাধীন। 1947-এ ম্যাট্রিক দিই শান্তিনিকেতন কেন্দ্র থেকে। তখন আমরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও বিশ্বভারতীকে স্বীকৃতি দেয়নি। পরাধীনতার ক্ষোভ আমাদের প্রবলভাবে নাড়া দিত। দেশকে স্বাধীন করতেই হবে এই সংকল্পে আমাদের কোনও দ্বিধা ছিল না। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় আসার পর ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। সে যুগে রাজনীতি আজকের তুলনায় অনেক পরিষ্কার ছিল। আমি কখনও কম্যুনিস্ট ছিলাম না, কিন্তু আমার অধিকাংশ বন্ধুই কম্যুনিস্ট ছিলেন। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে দিলীপ সেনগুপ্ত মতাদর্শে কম্যুনিস্ট ছিলেন। তাঁরা থাকতেন 55, লেক প্লেসে। পুলিশের চোখে এটি কম্যুনিস্ট আড্ডা। দিলীপ প্রায় চারবছর যাদবপুরে আমার ছোট্ট বাড়িতে একজন হয়ে থেকেছে। আমরা দু'জনে দুইভাই হয়ে গিয়েছিলাম। ভালবাসার ভিত্তি এত প্রবল ছিল যে, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য আমাদের সম্পর্কে কোনও আঁচড় কাটতে পারে নি, অথচ দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।

ছাত্র রাজনীতিতে আমি ছিলাম জয়প্রকাশপন্থী। তারও কারণ ছিল। 1942-এর পর জয়প্রকাশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে লুকিয়ে ছিলেন। সে সময় তাঁকে মাঝে মাঝে দেখেছি।

কম্যুনিস্টরা স্বাধীনতার অল্প পরে সাংস্কৃতিক জগতে একটা বিপ্লব এনেছিলেন। একগুচ্ছ প্রতিভা আগুন ঝরিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দারিদ্র্যের আঙিনায় আসতে চেয়েছেন। কিন্তু ঢুকতে পারেননি।—সেজন্য তাঁর দুঃখ ছিল। সে দুঃখ তিনি প্রকাশও করেছেন। তিনি যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন—

যেথায় থাকে সবার অধম
দীনের হতে দীন

সেইখানেতেই চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।

(এটি গান্ধিজির অতি প্রিয় গান ছিল)

সর্বহারাদের প্রতি তাঁর মনোভাব কিছুটা রাশিয়ার চিঠিতে পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তীকালে রাশিয়ার চেহারা পালটে যায়। নিজেও বলেছিলেন (স্মৃতি থেকে বলছি)

মাঝে মাঝে গেছি আমি
ওপাড়ার প্রাঙ্গনের দ্বারে
ভিতরে প্রবেশ করি
সে শক্তি ছিল না একেবারে।
কিষানের মজুরের শরিক যেমন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে কবি আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি

(স্মৃতি থেকে লেখা বলে ভুলভ্রান্তি থাকলে ক্ষমা করবেন। ৮৫ বছর হতে চলল—সবসময় সাধারণ ব্যাপারে বই ঘাঁটার ধৈর্য নেই—আর এসব লেখা তো পাঠকের একদম চেনা তাঁরাই শুদ্ধ করে নিন।)

আজকের আলোচনার শিরোনাম থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। সম্পাদক বলেন আমি ছোট করে আমার বক্তব্য বলতে পারি না—তিনি ঠিকই বলেন—কিন্তু আমার লেখা সচরাচর অমনোনীতও করেন না। সেটা আমার নিতান্ত সৌভাগ্য।

মণিলাল ভৌমিক ফিজিক্স-এ বি.এস.সি (অনার্স)-এ আমার সহপাঠী ছিলেন। আজ তিনি আমেরিকায় পদার্থবিদ্যার অন্যতম দিক্‌পাল। মাঝে মাঝে কোলকাতায় আসেন—কাগজে তাঁর কথা বের হয়—হয়তো একদিন তিনি তাঁর আবিষ্কারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবেন। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাঁর ফোন নম্বর যোগাড় করতে পারিনি। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখবার বা ফোনে তার সঙ্গে কথা বলবার বাসনা জাগে। যতদূর মনে পড়ে মণিলাল গরীব ঘরের ছেলে। কোলকাতায় পড়বার আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। সেদিনের দুই কংগ্রেস প্রধান প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষ তাঁকে আশ্রয় দেয়। যেহেতু ক্লাস ভর্তি প্রায় সবাই বামপন্থী সেজন্য তাঁর কিছুটা অস্বস্তি ছিল। আমি সাচ্চা বামপন্থী নই—সেজন্যই আমার কাছে তিনি প্রায়ই আসতেন। আমরা তখন থাকতাম মুদিয়ালীর কাছে এস. আর দাশ রোডে—কাছেই ছোট লেক। (তখন পর্যন্ত বড় লেক ছোট লেক দু'টি কথাই চালু ছিল)।

আমরা দু'জন ঘন্টার পর ঘন্টা লেকের পাশে বসে নানারকম গল্প করতাম। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন আমরা স্কটিশ চার্চে পড়তে এলাম। আমি এসেছিলাম প্রেসিডেন্সি ছেড়ে। প্রেসিডেন্সি তখন কেতাদুরস্ত কলেজ। প্রেসিডেন্সি ছেড়ে কেউ সচরাচর স্কটিশে ভর্তি হননা। স্কটিশে তখন ভারপ্রাপ্ত পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। এঁর সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। আজকের আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁর ছেলে প্রবীর রায় চৌধুরীও আমাদের সহপাঠী ছিলেন। দেবীপ্রসাদের মতো নানা বিষয়ে এত গভীর জ্ঞান আমি আর প্রত্যক্ষ করিনি। এখন ক্লাস XI ও XII স্কুলে পড়ানো হয়। আমরা পড়তাম কলেজে—তখনকার দিনের আই.এস.সি পড়েছি প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি.এস.সি. (অর্নাস) পড়তে স্কটিশে আসি দেবীপ্রসাদের আকর্ষণে। শোনা যায় দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলেন। সবচেয়ে কম নম্বর পান বিজ্ঞানে। আই.এস.সি. পড়লেন—প্রথম হলেন এবার তুলনায় কম নম্বর পদার্থ বিদ্যায়। পদার্থ বিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেন—তুলনায় কম নম্বর পেলেন চুম্বক বিদ্যায়। চুম্বক বিদ্যা স্পেশ্যাল পেপার নিয়ে আবার প্রথম হলেন এম.এস.সি-তে এবার তুলনায় কম নম্বর Thermo Dynamics এ। Thermo Dynamics-এ একেবারে ডি.এসসি. হলেন। এহেন অধ্যাপকের কাছে পড়বার আশায় আমাদের স্কটিশে আসা। স্কটিশে 3rd year এ কয়েকজনকে অনার্স পড়তে দিলেন। তবে একটা শর্তে—ভাল ফল করতে না পারলে 4th year এ honors রাখা চলবে না। এজন্য আমরা মন দিয়ে পড়াশুনো করেছি। আমাদের মধ্যে মণিলাল ভৌমিক খুবই ভাল ছাত্র ছিলেন।

আমাদের তখন Physics Reunion ছিল। সেখানে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা অনুষ্ঠান করতেন—প্রায়ই রসাত্মক। সেই কৌতুক রস দিয়েই আজকের বক্তব্য শেষ করি। মণিলাল Physics Reunion-এ একটি Parody পড়েছিলেন। আজ তাঁর সেই কথা স্মরণ আছে কিনা জানি না। দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর প্রথম নাম দেবী। দেবী দিয়েই কবিতার শুরু। দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে / অনেক গুণি ও জ্ঞানী / আমি অভাগা এনেছি বাহিয়া নয়নজলে / ব্যর্থ সাধনাখানি / আমার ফেলের সাধনাখানি / তুমি যদি দেবী পলকে কেবল / কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল / তাহলে মোর 4th year honors থাকিবে জানি।

মণিলালকে দেখিনি 66 বছর। তাঁর গবেষণার বিষয় আমার মাথায় নাও ঢুকতে পারে।

দূর থেকে আশা করি সে সফল হোক, দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক।

আমার বয়স হয়েছে—মণিলালেরও তাই। আবার দেখা হবার সুযোগ কম। দারিদ্র্য অতিক্রম করে একজন মানুষ কতদূর উঠতে পারে তার সার্থক নিদর্শন মণিলাল ভৌমিক। তাঁর সঙ্গে পড়ার সৌভাগ্য হওয়ায় আমি গর্বিত।

এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাজ

মহাশ্বেতা দেবী

[সমতটের গল্প-প্রতিযোগিতায় (1976-এর ফেব্রুয়ারি) পুরস্কার প্রাপ্তদের বাছাই করার দায়িত্বে ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ ও রাধাপ্রসাদ গুপ্ত—এই বিচারক-ত্রয়ী। আর সমস্ত ব্যাপারটা দেখভাল করেছিলেন অরুণকুমার বসু (ভাস্কর বসু)। পুরস্কার পেয়েছিলেন : সুব্রত নিয়োগী, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, বিপ্লব বিশ্বাস, তিমির পাল, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায় ও ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বিচারকদের মধ্যে দু'জন বহুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। আর 20/7/2016 বিকেল 3.15-তে চলে গেলেন মহাশ্বেতা দেবী, তাঁর একটা গল্প সমতট:29 (জুলাই 1976) থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।— স, স.প্র।]

১। শুক্রবার ৪ঠা জুন পদ্মমণি কলকাতা পৌঁছে যায়। সঙ্গে ছিল ওর বর, দেওর, চার ছেলে, তিন মেয়ে। এতগুলো লোক নিয়ে আজকাল কেউ দিদির বাড়ি এসে ওঠে না, দিদি যেকালে ঠিকে কাজ করে খায়। কিন্তু পদ্মমণির বর হঠাৎ আবাদের ওপারে বোনের সম্পত্তি পেয়েছে! গাঁ-বসতি তুলে সেখানে চলে যাবার আগে পদ্মমণি জেদ ধরল একবার তারামণিকে দেখতে কলকাতা আসবে। কলকাতা আসা কম খরচান্ত ব্যাপার নয়, এ কথা বলতে গিয়ে ওর বর মুখ শুনল।

আমার ছাগলের দুধ-বেচা টাকায় আসব যাব।

তাই ওর বর কিছুই বলল না। ওর দেওর বলল, এই দিনকালে দশটা মানুষ কোথা গিয়ে ওঠে? কী খাওয়াবে শুনি তোমার দিদি?

পদ্মমণি বলেছিল, সে গম্যি আমার আছে।

পদ্মমণি বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমেছিল। সেখান থেকে লেকের রেল-বস্তি অব্দি হেঁটেই এসেছিল। অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি কথা হল, পদ্মমণি কলকাতায় কখনো আসেনি। ওর বর বা দেওর এসেছে মাঝে-মধ্যে। কলকাতার পথঘাট দেখে ওর ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। দিদিকে মনে হচ্ছিল মহা সুখী, কিন্তু দিদির ঘর-বাসা দেখতেই তারামণির অবস্থা বুঝতে ওর দেরি হল না। তখনি পদ্মমণি বুঝেছিল তারামণির চেয়ে ও সুখী।

তখনি পদ্মমণি পেটকাপড় থেকে চালের পোঁটলা, গত-সনের জই থেকে এ-সনে ভাঙানো ছাতু নামিয়ে দিয়েছিল দিদিকে। তা ছাড়া মানকচু, তালপাটালি, একটা কুমড়ো। বরের গেঁজে থেকে বের করে এগারোটা টাকা।

এই এত দিতেছিস পদ্ম?

তুই তোকে দিতেছিস বল?

পদ্মমণি আর তারামণি হেসেছিল। তারামণিই বোনের বিয়েটা দিয়েছিল। ঘর-বসত করাবার সময়ে নিবারণের সংসার দেখে বলেছিল, জাজ্জ্বল্য সুখ হবে পদ্ম। যখন হবে, মনে জানবি দিদির জন্যে এত সব হল।

ক-দিন থাকবি, ও পদ্ম?

সোমবার চলে যাব।

সোমবার যাসনি। কিসের মিছিল, কিসের বা হাংনামা হবে।

তবে তার পরদিনকে?

২। শনিবার, ৫ই জুন তারামণির প্রতিবেশীর ভাষায় পদ্মমণির 'অন্ত ঘনাইল, যম আইয়া বল্‌ল ওঠ্ ছেম্‌রি চল্'।

ট্রেন আসে আর যায়, দেখে-দেখে পদ্মমণির আশ মিটছিল না। সেদিন ট্রেনে আর ট্রাকে বাইরে থেকে লোক আসছিল, পদ্মমণি দেখছিল আর দেখছিল। লাইনের দক্ষিণে তারামণির বাসা। বাসার হাঁড়ি-বাসনও ট্রেন এলে গেলে কাঁপতে থাকে। লাইনের উত্তরে লেক। পদ্মমণির ছেলেরা, বর, দেওর সবাই স্নান করছিল। হাতে কাপড়-গামছা নিয়ে পদ্মমণি লাইন পেরোতে যাবে, তখনি ট্রেন আসছিল।

সবুজে-ক্রীম রঙে সুন্দর, উদ্ধত, বেগবান ট্রেন। ট্রেন দেখে পদ্মমণি দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মাথায়, তারামণির প্রতিবেশিনীর ভাষায়, 'ঘোর চক্কর লাইগা ছেম্‌রি পড়ল'। প্রতিবেশিনী বয়েসে রাবণের মা নিকষা। সাত ছেলের মা পদ্মকে ও কাল থেকেই 'ছেম্‌রি' বলছিল। ঘুরে পদ্মমণি লাইনের পাশে খোয়ায় কপাল ঠুকে পড়ে ও কপালাস্থিতে বাড়ি খায়। সে আঘাতের ঘা করোটির ভেতর সযত্নে রাখা-মস্তিষ্ককে দমকলের ঘন্টা বাজিয়ে ভয় খাইয়ে দেয়। মহাশিরা ও অন্য রক্তবাহ শিরা ছিঁড়ে মাথার রক্ত-সংবহন ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়। পদ্মমণির মস্তিষ্কের রক্ত সংবহন ব্যবস্থা এমন ভয় খেয়ে যায়, যে কান দিয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে গলগলিয়ে। দুর্ঘটনা ঘটে সকাল ন-টায়।

তারপর ভয়ার্ত বিপন্ন তারামণি আর পদ্মমণির দিশাহারা বর পদ্মমণিকে নিয়ে দক্ষিণের হাসপাতালে যায় কিন্তু 'এখানে এ-সব কেস ভর্তি হয় না' তাড়া খেয়ে প্রথমে তারা 'দয়া কর বাবু গো' বলে মাথা কোটাকুটি করে, তারপর পদ্মমণিকে নিয়ে ধর্মপিতাদের হাসপাতালে আনে বেলা তিনটেয়। রাত ন-টায় পদ্মমণি আর পদ্মমণি থাকে না। এইচ, এফ, বয়স ৩৭; হিন্দু ফিমেল: ৩৭' ভর্তি হয়। প্রতিটি ওষুধ ইঞ্জেকশনের জন্যে টাকা চাওয়া হয় ও বলে দেওয়া হয় বেডের টাকা কম করতে হলে সকালে এসে কর্তাদের ধরতে হবে।

৩। রবিবার, ৬ই জুন সকালে এইচ, এফ, ৩৭কে তারপর ফোঁড়াফুঁড়ি, খোঁড়াখুঁড়ি চলে ও তারামণি মনিবদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ওষুধ ইঞ্জেকশনের টাকা তুলতে থাকে। পদ্মমণির বরকে বুক ও মাথা চাপড়াতে দেখে কর্তৃপক্ষ টাকার অঙ্ক কমিয়ে দেন বেডের। তারামণি ও পদ্মমণির বরের মুখে পদ্মমণির আঘাত লাগার কথা শুনে লেখা হয় এইচ, এফ, ৩৭ অ্যাডমিটেড। এমার্জেন্সি কেস। ট্রেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'ট্রেনের গায়ে লাগেনি গো বাবু। শরীলে কোতা কাটেনি দ্যাকো—তারামণির বিলাপ শুনে ভর্তি-বাবু কিছুমাত্র বিচলিত হন না। খেঁকিয়ে বলেন, 'ট্রেন না এলে মাথা ঘুরে পড়ত কি?' কিন্তু তাপরই, তারামণি যখন ফুটপাথে অবসন্ন হয়ে বসে থাকে, তার মিস্তিরি ছেলে বলে, 'সর্বনাশ করে এলে? মাসি যদি মরে, তবে কী হাংনামা হবে ভেবে দেখেচ? ও কথা কেউ লেখে? বলতে হয় কলার খোসায় পা পিছলে গেছল, নয় তো হোঁচট খেয়ে পড়েছে।'

তারামণি সে কথা শুনে হাপ্‌সে কাঁদে আর বলে, 'বুদ্ধি হরে গেল যে ও বাপ! মরবে বলতেছে কেন?'

পদ্মমণির বর, 'উ কি বলতেছিস' বলে আরো বিশ্রী ও অসভ্যভাবে কাঁদে। যেন পদ্মর বোনপো 'মরে' বলেছে বলেই পদ্মমণি মরবে। হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে ও এবং তারামণি দু'জনেই কাঁদতে থাকে কপাল চাপড়ে।

তারামণির ছেলে ডাক্তারের লেখা কাগজ নিয়ে ওষুধ কিনতে ছোটাছুটি করে ও বিয়াল্লিশ টাকা জোগাড় করতে পারে না কিছুতে। ওষুধ না নিয়ে হাসপাতালে ফেরা ঠিক হবে কি না ও ভেবে পায় না, ওর বয়েস মাত্রই সতেরো। আবার পায়ে-পায়ে ও ডাক্তারের কাছে ফিরে আসে এবং আরেকজন ডাক্তার আরেকটি প্রেসক্রিপশন ওর হাতে ধরিয়ে দেন। এবার ও তেইশ টাকা জোগাড় করে ওষুধ কিনে ফিরে আসে। তারামণি কান্না থামিয়ে পদ্মর বরকে বলে, 'অ্যাত ট্যাকার ওষুদ দিতেছে। নিচ্চয় ভাল হয়ে যাবে।' ওরা দু'জনেই ফুটপাথে ছায়া খুঁজে নিয়ে শুয়ে থাকে, শুয়েই থাকে। তারামণির মিস্তিরি ছেলে ওদের কাছে এসে বসে বটে, কিন্তু কথা বলে না।

সময় যায়, সময় যায়, মাঝে-মাঝে পদ্মর বোনপো ভেতর থেকে খবর নিয়ে আসে। এই ভাবেই রাত হয় রাত ঘনায়।

রাত দেড়টায় পদ্ম মরে যায়। এইচ, এফ, ৩৭ এক্সপায়ার্ড অ্যাট ওআন এ. এম. অফ.....। এই সার্টিফিকেটটি পরদিন লেখা হয় ও থানায় পাঠানো হয়।

৪। রবিবার ৬ই জুন, সেই রাতেই পদ্মর বোনপোকে ডাক্তার বলেন, কাল লাশ পেয়ে যাবে। পুলিশ কেস হবে না।

কিন্তু সোমবার, ৭ই জুন জানা যায় ময়না না করে লাশ ছাড়া হবে না। ভোরবেলাই খবর জানা যায় এবং থানা থেকে খবর না আসা অব্দি কিছুই করা সম্ভব নয় বলে ডাক্তার পদ্মর বোনপোকে তাড়া মারেন।

রাতে যে বলেছিল লাশ পেয়ে যাবে সেও ডাক্তার। এখন যে বলছে লাশ পাবে না সেও ডাক্তার। সন্ধেয় যে বিয়াল্লিশ টাকার প্রেসক্রিপশন লিখেছিল সেও ডাক্তার, রাতে যে তেইশ টাকার প্রেসক্রিপশন লিখেছিল সেও ডাক্তার। পদ্মর বোনপোর সব দেখে ধাঁধা লেগে যায়। যদিও ও বাবরি ও জুলপি রেখেছে, এবং অত্যন্ত ময়লা গেঞ্জি ঢেকে নকল টেরিলিন পরে আছে, তবুও ভদ্রলোক, বাবু, এদের সমীহ করে চলা ওর রক্তের অভ্যেস।

একই সঙ্গে, থানা-পুলিশকে ভয় করা আয়ত্ত-করা ওর অভ্যেস। এখন ওর মনে পড়ে যায় গোপাল আলুওয়ালা সুবাসীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ফলিডল খাওয়ার পর লাশ বের করতে, ওর ভাষায়, 'ডমকে' টাকা খাওয়াতে হয়েছিল। বর্তমানে ও টাকাপয়সায় নেহাৎ কাহিল। মা তারামণিও মনিববাড়িতে-বাড়িতে এমন কোন গুডউইল তৈরি করতে পারেনি যে ঘুষ দেবার টাকা পেতে পারে। মেসো যথাসর্বস্ব ত্রিশ টাকা বের করে দিয়ে বলে, ঝা পার কর বাপ মোর। তুমি শউরে ছেলে। মোরা গেঁয়ো মুখ্যু। সাঁঝ হবার আগে শ'সই না করলে সব্বনাশ হবে।

'সর্বনাশ!' তারামণির প্রতিবেশিনী গভীর তৃপ্তিতে টেনে বলে। পদ্মর মৃত্যুসংবাদ জেনেই ও সকাল-সকাল পদ্মর ছেলেমেয়ে দেওর সবাইকে নিয়ে এসে পড়েছে। তারামণির দেশ-ঘরের যত ঝি আশে-পাশে কাজ করে, সবাই আসে। প্রতিবেশিনী বয়সে নিকষা হয়েছে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেশি। তা ছাড়া কালীঘাটে এক ধনী-পুরুত বাড়ির বউরা বুকের গড়ন নষ্ট হবে বলে ছেলেদের দুধ খাওয়াত না। ওর দুধে মানুষ ছেলেরা এখন দলপতি, নেতা, মিসায় আটক, বেনামী শুঁড়িখানার মালিক। অতএব মৃতাশৌচ সংক্রান্ত সব খবরই ও জানে।

ও বলে 'সর্বনাশ! দাহ না অইলে ছেম্‌রি তোমার পাছে ফিরব। পোলাপানগো কাছে চাইব।' এ কথা শুনে সকলেই কাঁদে। বুক চাপড়ায়। পদ্মর বোনপোকে বলে, 'বেবস্থা

কর বাপ।' বোনপো থানায় যায়। মেসো ও মেসোর ভাই থানার বাইরে বসে থাকে। বোনপো ঢুকে যায়।

৫। সোমবার, ৭ই জুন সকালে থানাবাবুর মুখে-চোখে প্রসন্নতা, দয়া, মানবিক বিবেচনা খেলা করতে থাকে কেন না তিনি জানেন, যে-সব কথা দিচ্ছেন, তা তাঁকে রাখতে হচ্ছে না, অচিরে তাঁর ডিউটি শেষ হবে। আটটার পর থেকে অন্য ডিউটি। আজ সব মন্ত্রী ও মান্য লোকরা মিছিল করে বেরোবেন। সারাদিন কলকাতায় শান্তিপূর্ণ মিছিল চলবে। অতএব সমস্ত পুলিশ সকল লাশবওয়া গাড়ি দমকল আজ অর্জুন, মিছিলটি তাঁদের একাগ্র দৃষ্টি ও মনের সামনে মাছের চোখ।

তিনি আরো জানেন, দু'টোর পর লাশ পৌঁছলে সরকারি নিয়মে সে লাশ ময়না হয় না, ডাক্তারও মানুষ। শহরের কল্যাণে প্রত্যহই ডাক্তারকে বহু লাশ ময়না করতে হয়। হিম-কুঠরিতে লাশ জমেই থাকে। তিনি জানেন, এইচ, এফ, ৩৭ আজ ময়না হতে পারে না। তাই তিনি স্নেহবিগলিত কণ্ঠে পদ্মর বোনপোকে সান্ত্বনা দেন ও আগেই আঁচ করে নেন, এর দ্বারা এ-পকেট ও পকেট ফুটকিফাটকি সম্ভব নয়। আজকাল এই দরিদ্র্য দর্শন-ধারীদের বিশ্বাস করা গোখুরি। এরাই দশজন ছেলে ও এম. এল. এর চিঠি এনে হাজির করতে পারে।

তাই তিনি, একেবারে কেতামত কথা বলতে থাকেন, আইন বাঁচিয়ে। এখন আর তেমন সর্বনেশে দিন নেই যে টেবিলের সামনে অচেনা ছেলের ছায়া পড়লে চমকে আঁতকে পকেটে হাত দিতে হবে। সে-সময়ে যুবকদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বললে তাতে আন্তরিকতা থাকত না। এখন তাঁর কথাবার্তা কেতামাফিক হলেও আন্তরিক। তিনি মানুষ হিসেবেত ভালই। তাছাড়া, আজকাল, নতুন জ্যোতিষীকে দিয়ে, বিল্‌ডিং তৈরির সময়কে জন্ম সময় ধরে নিয়ে, এই থানা-বাড়ির কোষ্ঠীপত্র করিয়ে নেবার পর থেকে—এ থানাবাড়ির বৃহস্পতি এখন তুঙ্গী, তা জানার পর থেকে—এখন তিনি থানায় ঢুকলেই বাতাসে, ঘাম-রক্ত-মূত্র-সিগারেটের গন্ধে, পরমা শান্তির ভাসমান অস্তিত্ব টের পান। আশ্চর্য এই অদৃশ্য 'অ্যরা' বৎসলা জননী হয়ে তাঁর অন্তরের অন্তরকে কী যেন মুখে দিয়ে শান্ত করে ফেলে।

মনের ভেতর সেই পরমা শান্তি ফোঁটায় ফোঁটায় উছলে পড়ে। চোখ চাইতেই ধুলোমাখা ফাইলের চারপাশ ও কোনা-কানাচ থেকে লক্ষ্মী, গনেশ, কালীর ছবি দেখতে পান থানাবাবু। তিনি পদ্মর বোনপোকে বলেন কী বলছ বল?

আজ্ঞা, ময়না না করলে.....

তা কি হয় বাবা? ময়না কত্তেই হবে। নয়তো আমাদের মহাবিপদে পড়তে হয়।

ময়না কত্তে টাইন চলে যাবে।

আহা, হাসপাতলের খবর আমরা পেয়ে গেছি। টাইম যাবে কেন? আর গেলই বা। মরা মানুষ ত ফিরে আসবে না। ব্যস্ত কেন? মঙ্গলবার পেয়ে যাবে।

আজ্ঞা, রবিবার মরেছে, মঙ্গলবার হলে তিনদিন হয়।

তা ত হলই।

অপঘাতে মিত্যু ত। মড়া বাসি হলে দোষ পায়, শাদ্ধ শান্তি তাড়াতাড়ি সারা দরকার।

সি কি! বামুনের মড়া ত নয়!

আমার মেসো হরি সংকীত্তন গায়। উনির সকল কাজ বামুনের নিয়মে।

থানাবাবু বোঝেন এ ছেলেটি নেহাৎই বিভ্রান্ত, দিশাহারা, কেমন যেন মনে হয়, এর পেছনে দলবল নেই। বোধহয় ছেলেটা একা। আবার ওঁর মনে দয়া উছলে উঠে আসে। সহৃদয় মমতায় বলেন, দেখ, পুলিশ হলে কি হয়। দয়ামায়া এ সব ক্ষেত্রে সবাই করে। হট করে ময়না সারা কি আমার হাতে? আগে রেল-পুলিশের অনুমতি চাই।

রেলপুলিশ কেন?

বা, মড়া'ত এখন রেলপুলিশের সম্পত্তি। দেখ, তুমি শেয়ালদা চলে যাও। রেলপুলিশের কাছ থেকে লিখে আন। ইদিকে আমরা হাসপাতালে বলে কয়ে রাখব। তোমার হাতে রেলপুলিশের চিঠি পেলে তবে আমরা সরেজমিন ইংকুয়েস্ট করে লাশ কাঁটাপুকুর পাঠাব।

আজ হবে সব?

নিশ্চয় নিশ্চয়। দেখো, বিকেলের মধ্যে লাশ ময়না হয়ে পেয়ে গেছ।

পদ্মর বোনপো কাল সকাল থেকে চব্বিশ ঘন্টা ঘুরছে আর ঘুরছে। এখন ওর শরীরে ঝিম মেরে আসে, পেটের ভেতর নাড়িগুলো পাকায়, পেঁচিয়ে ওঠে, জড়ায়, পাক খোলে। এখন একটু ঘুমোতে পারলে শরীর বাঁচত কিন্তু মেসো ও মেসোর ভাইয়ের অগাধ বিশ্বাসের উক্তি 'তুমি শউরে ছেলে, সব জান', ওর ওপর যেন আরো গুরুভার দায়িত্ব তুলে দেয়। এইচ, এফ. ৩৭ যেন যাত্রাদলের অধিকারী। ওর ওপর এক বয়স্ক, অভিজ্ঞ, ঝানু, এলেমদার, চালু, হয়কে-নয় করবার ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের ভূমিকা সেই অধিকারী চাপিয়ে দিয়েছে। অতএব ও যে ঠিকে ঝিয়ের হতভাগা আধভাতার হাফ-মিস্তিরি ছেলে, সে কথা ভুলে গিয়ে আরোপিত ভূমিকায় কাজ করতে থাকে। মেসোদের বাসায় পাঠিয়ে দেয় ও। বলে, আমি আছি, ভাব কেন? যেয়ে চান কর, যা হয় খাও।

ও নিজে এক কাপ চা ও দু'খানা লেড়ো বিস্কুট খেয়ে নিয়ে শিয়ালদা চলে যায়। কিন্তু প্রথমত ও জায়গাটি চিনতে পারে না। তারপর ট্রেনের পর ট্রেনে শুধু মিছিলধারী জনতা আসছে বলে ভিড় ঠেলে ঢুকতেও ওর দেরি হয়। এই সময়েই বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

রেলপুলিশের থানাবাবু প্রথমে, ক্যা.....? বলে হাঁকড়ে ওঠেন, কিন্তু হাঁকড়ানির পরিশ্রমে ঘাম গলগলিয়ে বেরোয় বলে পার্বতীর ভূমিকায় তামিল অভিনেত্রীর উত্তুঙ্গ চেহারা-আঁকা ক্যালেন্ডারের দিক চেয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়েন, ঝিমিয়েই থাকেন। তারপর বলেন, বাতি জ্বলুক, পাখা চলুক, নইলে কাজ করতে পারব না।

পদ্মর বোনপো বলে, থানা থেকে যে পাটিয়ে দিল।

দিক গে। এ কি তাদের মড়া? আমাদের মড়া, আমাদের সুবিদেয় কাজ হবে। বুঝেছ বাপ?

মড়া বাসি হচ্ছে বাবু।

যাও যাও বাইরে যাও।

দু'টোর পরে কাঁটাপুকুরে লাশ নেবে না।

কে বললে? থানায় বলেছে বুঝি? কাঁটাপুকুরের টাইম আমায় দেখাচ্ছে। কাঁটাপুকুরে হপ্তায় ক'টা লাশ আমি পাঠাই জান? আমাকে কাঁটাপুকুর দেখাতে এসেছ?

বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয় একটায়। দেড়টায় ছেলেটি একখানা কাগজ পায় : ময়নার পরই এইচ, এফ.৩৭-এর লাশ আত্মীয় বৈরাগীচরণ নাইয়াকে দেওয়া যেতে পারে! মে বি হ্যানডেড ওভার.....

আড়াইটেয় ছেলেটি থানায় গিয়ে কাগজটি দেয়। ডিউটি-বদলি অন্য থানাবাবু, থানার সকলে এখন বেজায় ব্যস্ত। শান্তিপূর্ণ মিছিল শুরু হয়ে গেছে। এখন সকলের মন-প্রাণ-কান-চোখ অর্জুন। মিছিলের খবর মীনচক্ষু। থানাবাবু বলেন, কাগজ এনেছ, রেখে যাও। মঙ্গলবার খোঁজ করবে।

ছেলেটি বোঝে এইচ, এফ.৩৭-আরোপিত ভূমিকার প্রতি সে সুবিচার করতে পারল না। সহসা কেঁদে ফেলে ও। সতেরো বছরের বয়ঃসন্ধি পেরনো, চোয়াড়ে চেহারার ছেলেটিকে কাঁদবার সময়ে ভারি বিশ্রী দেখায়।

থানাবাবু, ল্লে বাবাঃ, বলে চেআরে হেলান দিয়ে বসেন।

বলেন, দেখ! হবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এক কত্তে পার।

কি কাজ?

আলিপুরে পুলিশ কেস হাসপাতালে মেয়ে ডাক্তার-বাবুর হাত পা ধরে ঝুলে পড়। এখন ময়না হয় না। তবে যদি উনি রাজি হন, তবে আমরা লাশ কাঁটাপুকুরে কাল সকাল ন-টার মধ্যে পাঠাব।

আজ্ঞা, আজ হয় না?

না না, আমাদের লোক যাবে, সরেজমিনে ইংকুয়েস্ট করবে তবে ত!

সকালে বাবু বললেন.....

যাও, যাও, মেলা দেরি কর না। আর দেখ, ডাক্তার কি বলেন, এখানে বলে যেও। তোমাদের কি! যত.....।

ছেলেটি এখন বোঝে, তিনটে বাজতে চলল, আলিপুরে ওকে হেঁটেই যেতে হবে। এক-ফেরতা হেঁটে গেলে ফিরে-ফেরতা ও বাসে ফিরতে পারবে। দু'বারের ভাড়া দিলে কুলবে না। তাই ও প্রখর রোদে, গলন্ত পিচে সস্তার হাওয়াই চটি ছটকে চলতে থাকে। ওর মাথা ও শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কখনো আসে, কখনো মস্তিষ্কে লোডশেডিং হয় ঘন-ঘন। কাল থেকে পেটে দানা নেই, কয়েকবার চা ও লেড়ো বিস্কুট খেয়েছে শুধু, কিন্তু কিছুতে ও এখন বেরতে পারে না। চক্রব্যুহে ধৃত। ওকে ভেতরে ঢুকতেই হয়, ঢুকে চলতেই হয়।

পুলিশ-কেস হাসপাতালে ও ডাক্তারকে প্রথম দেখতেই পায় না। ময়লা, ধূলো-ওড়া বারান্দায় ক'জন তাস পেটে। চারদিকে আবর্জনা। কিন্তু সমানে কেস আসতে থাকে, মাথা ফাটা, হাত ভাঙা, পাঁজরে চোট। এত কেস কিসের, বলতে গিয়ে ও ধমক খায়। থামে ঠেস দিয়ে চেয়ে থাকে, এবং গোপাল আলুওয়ালার মৃত্যুজনিত ব্যাপারে সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে ডাক্তারের চেহারা চেনা আছে এই ভরসায় ঘন-ঘন চারদিকে চাইতে থাক। ডাক্তারকে দেখেই ও গিয়ে সামনে বসে পড়ে ও কাতরে বলতে থাকে, বাবু! ডাক্তারবাবু!

ময়না-পার্টির লোকজন দেখে-দেখে ডাক্তারবাবু মানুষের কাছে আর মানুষী ব্যবহার আশা করেন না। ছেলেটিকে তিনি কাঁদতে দেন। তারপর ওর প্রার্থনা শুনতে থাকেন। সব শুনে এখন ধীরে, শিশু ভুলিয়ে বলেন, এখন ময়না করতে হলে, ডোমদের ত ছুটি! বুঝলে কি না, ডোমদের খবর দিতে হবে, মদ খেতে পঞ্চাশ টাকা!

গোপালের বেলা ডোমদের পনেরো টাকা দিছ্লাম আমরা।

সে কবে?

বচর ঘুরে গেছে।

এখন কি আর তাতে ওরা মানবে? গরিবকে টাকা ধসাব মিছেমিছি, সে আমার পছন্দ নয়। এখন দাহ আছে, শ্রাদ্ধশান্তি আছে। দেখ! থানায় বল গে! লাশ যেন পৌঁছে যায়। মঙ্গলবার দিনকে আমি আদালত থেকে আসতে বেলা একটা বাজবে। সে সময়ে তুমি এখানে থেক। তখন আমি যাব। বরঞ্চ, দু'টোর মধ্যে, সবচে আগে তোমাদের লাশ ময়না করে দেব। যাতে করে সাঁঝের মধ্যে সব সেরে আসতে পার।

অপঘাত মিত্যু কি না!

এর আগে হয় না।

ডোম যদি রাজি হয়?

দেখ! টাকা যদি জোগাড় হয়, সন্ধের আগে আমায় কাঁটাপুকুরে যেয়ে জানিও। ডোমদের বলতে ত হবে।

ছেলেটি এখন থানায় ফেরে। ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাজে। ওর কথা শুনে থানাবাবু বলেন, কাল ন-টার মধ্যে লাশ পেলে ডাক্তার ময়না করবে? বেশ! ও জিতেন! জিতেন!

একটি শক্ত-সমর্থ, আত্মস্থ চেহারার যুবক এসে দাঁড়ায়। ঘামে ঘন নীল জামা গায়ে সেঁটে থাছে, চোখ রক্তাভ, দৃষ্টি উদ্ধত।

কী বলছেন?

কাল সকালে দুটো, না, তিনটে লাশ আনতে হবে।

হবে না।

কেন?

ডাক্তার ময়না করবে না।

করবেন বাবু, বলেছেন করবেন।

আজ এতক্ষণ অব্দি লাশ-বওয়া ভ্যান ওদিকে আটকা ছিল। আমারও কাল ডিউটি নেই।

থানাবাবু কী যেন ওকে বলতে থাকেন, জিতেনকে। ছেলেটির আচ্ছন্ন চেতনা ও শ্রবণে রেলবস্তি.....'—'র এলাকায়.....'—' মিত্তির আজ নয় মিছিলে ব্যস্ত আছে, কাল..... সেবার সেপ্টেম্বরে..... শব্দগুলি লুকোচুরি খেলতে থাকে। হঠাৎ জিতেন বলে, ঠিক আছে যাব, কাল কাঁটাপুকুরে লাশ চলে যাবে। কিন্তু তিনটে কিসের?

এদের কেসটা রেলপুলিশের, একটা জলে-ডোবা, সেই পচা-চোলাইয়ের লাশটা, তিনটেই ত হল।

জিতেন বলে, লাশ যাবে, তা হাসপাতালে ঠাণ্ডাঘরে ছিল, ভাল থাকত। যদি কাল না হয়, মড়ার গাদার মধ্যে কাঁটাপুকুরে, ইঁদুরে চোখ খুবলে খেয়ে নেবে তা জান?

না বাবু! তা যদি হয়....

পরে মড়া গেলেই ভাল ছিল, এই ত? না, জিতেন দোলুইয়ের এক জবান। কালই যাবে লাশ।

ছেলেটি থানা থেকে বেরোয় ছ-টার পর। এখন ও সাদার্ন অ্যাভিন্যুর সুখবিলসিত, আলুলায়িত, সুখী ও সুন্দর জনতার জন্যে উৎসর্গীকৃত বুক ধরে চলতে থাকে। এখন গিয়ে ভাঁটিখানায় পাড়ার হর্তা-কর্তা-পাতা ও ত্রাতার কাছে ধর্ণা দিয়ে এইচ, এফ.৩৭ যাতে নিঃসম্বুলে ভিখিরির মত নিখরচায় দাহ হতে পারে, ঘাটবাবুর নামে একখানা সুপারিশ চিঠি নেবে।

বাড়ি ফিরবার আগে অবধি ওর ধারণা থাকে ও চক্রব্যূহের ভেতর আছে, এবং একটি ট্রেন—হাসপাতালের সারি-সারি ডাক্তার—থানাবাবুরা—রেলপুলিশ—ময়না-ডাক্তার—জিতেন দোলুই, এরাই কৌরব।

বাড়ি ফিরে বোঝে কৌরবদের দলবদ্ধতা অতি পাকা বনেদে বাঁধা। কেন না ও যখন বলে, মঙ্গলবারের আগে হচ্ছে না—তখনি সবাই হাউমাউ করে ওঠে।

তারামণির প্রতিবেশিনী বলে, তয় না তর এত চিনা, এত জানা? মরছে রবিবার, সৎকার হইতে মঙ্গলবার?

ছেলেটির মা, মেসো, মেসোর ভাই, সবাই ওকে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় আক্রমণ করে। ছেলেটি অবসন্ন ক্লান্তিতে রাগবার শক্তিও খুঁজে পায় না। আজ মিছিল ছিল বলে ভ্যান ছিল আটকা। রেলপুলিশের কাছেও দেরি হল। এ-সব কথা বলতে তার রুচি হয় না। এইচ, এফ.৩৭ তাকে যে ভীষণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করেছে, ছেলেটি বোঝে, এরা ভাবছে ও সে-ভূমিকার দায়িত্ব পালনে ফেল করেছে। ছেলেটিও সারাদিনে ভেবেছে ও ফেল করেছে। কিন্তু এখন ও, এই শোকাহত, মূঢ়, নির্বোধ, প্রেতভীত মানুষগুলির দিকে চেয়ে বোঝে, না, ও সে-ভূমিকার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে। ও যা করেছে, তা কর্মবীরের যোগ্য কাজ। যত পথ হেঁটেছে যত দরবার করেছে, যত দরজায় ঘা মেরেছে, তা সামান্য মানুষ পারে না। এখন ওর ক্ষুধার্ত, আচ্ছন্ন, অবসন্ন চেতনায় মনে হয়, এইচ, এফ.৩৭ বুঝি বা সর্বশক্তিমান। ওকে দিয়ে এত সব কাজ করিয়ে নিল। ওর খুব মনে হয়, মা অন্তত, কিছু খা, হাতে-মুখে জল দে, বলতে পারত। কিন্তু মা কিছু বলে না। মনে হয়, চিরকাল মা, ও যা-যা পারেনি তা নিয়ে অন্ধ আক্রোশে ওকে বেঁধে। ও কিন্তু তারপরও

মা ব'লে, বোন ব'লে, টাকাকড়ি সর্বস্ব এনে-এনে দেয়। এ জন্মে ওর এই একতরফা ভূমিকা। কিছু না বলে ও উঠে পড়ে। 'সী দ্যাট এইচ. এফ. ৩৭ হ্যাজ এ পপার'স ফিউন্যেরাল' লেখা কাগজটি বের করতেই হবে। কাল দাহ সেরে ঘুমনো যাবে।

কোতা যাস, ট্যাকা দে ঝা!

তারামণি চেঁচিয়ে বলে। ছেলেটির সহসা মনে পড়ে, এত হেঁটে বেড়াল, কই, মেসোর দেওয়া তিরিশ টাকা ওর শার্টের ভেতর পকেটে পলিথিনের ঠোঙায় মুড়ে সেপটিপিনে যেমন আঁটা রয়ে গেল, মনে পড়েনি ত?

ও বলে, টাকা থাক মঙ্গলবার খাটিয়া কেনা আছে।

দে ঝা!

ও নীরবে টাকা বের করে দেয় ও এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে বেরিয়ে যায়। বোন চেঁচিয়ে বলে, মিস্তিরি নোক প্যাট্যেছিল দাদা! কেন আসনি শুধোচ্ছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর করে না।

৬। সোমবার ৭ই জুনের মধ্যে পদ্মমণি, তারামণির গাঁ-জ্ঞেয়াতি আরো পাঁচজন এসে পড়ে। বহু জনের কথায়, আলোচনায় বাদ-প্রতিবাদে ক্রমে ছেলেটির বিষয়ে গভীর অবিশ্বাস রচিত হয়। মেসোর ভাই বলে, ঝা করছে সকল একা। মোদের কিছু বলে নে কেন?

তারামণি বলে চেরকাল একোরকম অইল।

মেসো বলে, ডাক্তার বলেছে বেলা এট্টায় যাবে, তা কি হয়? এট্টায় যাবে? তকন গেলে অতগুলোন লাশের চেড়াই ফাড়াই হয়।

তারামণির প্রতিবেশিনী বলে, তা কি অয়? বাবা, লাশঘরের নিয়ম, বাতি জ্বললে লাশ কাটব না। সূর্য থাকতে রইতে হকল সারা চাই। অহন একটা কইছে, না আটটা, কে কইব? আমি কই, তোমরা বিয়ান অইতে গিয়া বইয়া আহ। ছেম্‌রার কথায় বিশ্বাস কী?

সোমবার ৭ই জুন, ছেলেটি নিখরচায় দাহ করাবার সুপারিশ চিঠি জোগাড়ে আরো বহু পথ হাঁটে ও শেষে জোগাড় করে।

৭। মঙ্গলবার ৮ই জুন, ভোর না হতে পদ্মর বর, দেওর, বড়-মেজ দুই ছেলে, জ্ঞাতিগুষ্ঠী, তারামণি, তার প্রতিবেশিনী, সবাই গিয়ে কাঁটাপুকুরে বসে থাকে। ছেলেটি ওদের নিরস্ত করতে পারে না, ও একসময়ে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লেকের ধারে গাছের নিচে পড়ে ঘুমোয়। ওর ওপর পুষ্পিত বকুল পুষ্পবর্ষণ করে, ও গগনবিহারী চিল সপ্রেমে চাইতে থাকে, জলগন্ধী বাতাস ওর কপাল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়।

বারোটায় উঠে পড়ে, লেকের জলে চোখমুখ ধুয়ে, প্যান্টের ওপর গামছা বেঁধে ও হাসপাতাল যায়। ডাক্তার একটার বদলে সাড়ে তিনটেয় আসেন। তারপর কাঁটাপুকুর। এইচ. এফ.৩৭-এর লাশই প্রথমে বেরোয়। 'উইদিন সান্‌সেট!' ডাক্তার ব্যক্তিনিরপেক্ষে নিরুদ্দেশকে ঘোষণা করেন! তারপর ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। দরজার ফোকর দিয়ে না দেখে ছেলেটির বিফল-যুধ্যমান কর্ণের মত অস্তমান সূর্যকে লক্ষ করা উচিত, তবু ও দেখতে থাকে। এইচ. এফ.৩৭-এর লাশের চেহারা বড় সুন্দর মনে হয়। সুন্দর মনে হয়। শুধু পায়ের নিচে যেন সাদা চুনের ডোরা-কাটা।

লাশ হাতে পেলে বোঝা যায় পিঁপড়ে চোখ খায়নি, কিন্তু লাশঘরের ইঁদুর স্বাধিকারবলে পায়ের নিচের মাংস সযত্নে কুরে খেয়ে অস্থিজাল উদলা করে রেখে গেছে। লাশ খাটিয়ায় তোলা হয়।

এইচ. এফ.৩৭-এর লাশ অবশেষে নিখরচায় বিদ্যুৎ-চুল্লিতে ঢুকে যায়। ছেলেটি এখন উত্তরে হাঁটে। কার্তিক-ঘাটের কোনো পুরুত, দাহ হতেই অপঘাত মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত-শ্রাদ্ধ সেরে দেবে। দর কষতে হবে।

সব সেরে ফিরতে রাত দশটা বাজে।

বুধবার, ৯ই জুন স্বর্ণাভ প্রত্যুষে পদ্মর বর, দেওর সবাই দেশমুখো ট্রেনে চাপে। একটু বেলায় কাজে গিয়ে ছেলেটি জানে বিনা নোটিশে কামাই করার জন্যে ও বরখাস্ত হয়েছে।

** সমতটের আগামী সংখ্যায় (#190) মহাশ্বেতা দেবীর বিষয়ে স্মৃতিতর্পণ করবেন কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত*

মা

সলিল চট্টোপাধ্যায়

এখন ওরা বাড়ি ফিরবে। পুরভবনের মস্ত পুরোনো ঘড়িটাতে টকাস টং টকাস টং শব্দে এগারোটা বাজার খবর হল। বাবুজির লাল ফতুয়াটা দেখতে পাওয়া, অমনি ও ঠেলা গোছাতে শুরু করে। বাবুজির দিকে আর তাকাতে হবে না। ও বুঝে গেল বাবুজি আজকেও তাসে হেরেছে এবং নেশাও করেছে খুব। টাকা নিশ্চয় একটাও ফেরেনি। কবেই বা ফেরে! আজকে নিম্বু-মিকচার ভাল বিক্রি হয়েছে হাই ইস্কুলের টিফিনে। কিছু না হলেও দুশো টাকা তো হয়েইছে। বিকেলে পার্কেও হল একশোর বেশি। অতগুলো টাকা বাবুজি উড়িয়ে দিলো!

সেই থেকে এতোটা সময় সিনেমাঘরের এখানে দাঁড়িয়ে। বিক্রি হল কত—মাত্তর একশো তিরিশ টাকা! মা বলে দিয়েছিল ঘরে আটা ডাল তেল সব ফুরিয়েছে, বলেছিল অন্তত পাঁচকেজি আটা, অল্প ডাল তেল আনতেই হবে। চাল তো নেইই। বাবুজিকে এখন আর কিছু বলার সাহস নেই। যদি এই টাকা ক'টাও বাবুজি কেড়ে নেয়? যদি টাকাকটি নিয়ে বাড়ি পৌঁছাতে পারে লুকিয়ে। মাকে ওই ক'টা টাকা দিয়ে তাদের চারজনের পেটে দেবারটা জোগাড় করতে হবে। তখন যদি বাবুজির মুখে একটি আওয়াজও শোনা যায়! মাথা নামিয়ে ভালমন্দ কিচ্ছু না বলে খেয়ে উঠে যাবে। কখনো কি জিজ্ঞেস করল আটা আনতে হবে নাকি? কি তেল আনাজ কি লাগে? কোনোদ্দিন না। ঠেলা নিয়ে বেরুবার মুখে শুধু একবার তদারকি—কি কি নেয়া হল অথচ এই চানা, মটর, মুঙ্গ একটাও যদি বাবুজি কিনত বা কি করে আসছে একটু ভাবত! মা যে কি ভাবে কি করছে কেউ জানে না, কেউ বোঝে না, বুঝতে চায়ও না।

দাদিমা তো সারাদিন মাকে গাল পাড়ছে। মার জন্যেই নাকি তার অতো ভাল লড়কা বিরজুপরসাদ বরবাদ হয়ে গেল,—নেশাড়ু, জুয়াড়ি হয়ে গেল। যখন বাবুজি মাকে ধরে ধরে পেটাতে শুরু করে কখ্খনো এগিয়ে আসবে না,—যেন যা হচ্ছে ভালই। আসবে বড়িমা, চ্যাচামিচি করে মাকে আড়াল করে বাবুজিকে ঠেকাবে। একবারই শুধু বড়োবাবা এসেছিলো। এসেই বাবুজিকে এক জবরদস্ত তমেচা—বাবুজি মাথা ঘুরে চিৎপাত। নেশার ঘোরে থাকে তো—কোনো খেয়াল বুদ্ধি থাকে?

এই দেখ এই যে ঠেলাটা ধরে ধরে হাঁটছে মানে ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে বল। পারবে না,

পারবেই না। বাড়ি পৌঁছলে আজকেও লাগবে। কাল যে ঠেলা নিয়ে বেরুবে মাল কই? মালের জোগাড় কোত্থেকে হবে। পরপর দু'রাত সারাদিনের কামাই বাবুজি নেশা করে তাসের আড্ডায় সব উড়িয়ে দিয়েছে। কাল কি হবে? বাবুজি কি এসব ভাবে না!

বাবুজির কেবল ওসব কথা 'মাহিশ্‌শোয়ার পরসাদ কি আউলাদ হম, হমলোগোঁ কি ইজ্‌জত কোই মামুলি বাত নহি।' কে মহেশ্বর প্রসাদ? তার দাদাজি মহেশ্বরপ্রসাদের চানা ভুজিয়ার খুব নাম, সেই থেকেই। দাদাজি পশ্চিমের কোন দূর থেকে এসে এ শহরে চানাচুর বানিয়ে বিক্রি করতো। তারপরে আস্তে আস্তে দোকানে দোকানে প্যাকেটের বিক্রি বাড়তে লাগল। তারও পরে ওই ফ্যাকটরি যেখানে এখন বড়েবাবা বসে কারবার চালাচ্ছে। এখনো তেমনি কি তারচেয়ে আরো অনেক বেশি হয়েছে কারবার। তাহলে তাদের কেন এই হালত্!

মা বলে 'বদনসিবি'। দাদি বলে তোর মা ওই 'চুড়েইলঠো! মেরা বিরজুকো বরবাদ হি কর দিহিস!' 'ঘোড়েকা অন্ডা! তোমার ছেলে তো সবাই বলে তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে গোল্লায় দিয়েছো। দাদাজি কিছু নাকি বলতেই পারতো না ওকে। বড়েবাবা মাল নিয়ে বাজারে ঘুরে বিক্রি করতো সেই বচপন থেকে। তার মাঝে ইস্কুলও করেছে। আমার বাবুজি ফেল ফেল ফেল। ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিল। তখন আমার মা কি ছিলো? তখন তো তুমিই ছিলে। কোনো দিন কারখানায় যেতো না। বড়িমা বড়েবাবা কিছু বলতে পারতো না তোমার জন্যে।' 'ইসব ফালতু বাত ছোড়্!' 'কেন ছাড়বো? তুমি আমার মাকে মন্দ বলবে না!' থামবে না দাদি। তার বিরজু কি বঢ়িয়া গানা গাইতো, কি এ্যকটিং করতো। কবে কে তহ্‌শিল্‌দার মেডেল দিয়েছিলো। নাকি বুম্বাই যেতে চেয়েছিল—গেলেই নাকি হিরোর কাজ পক্কা!

সব শুনে দাদাজি এমনি খেপে গেল, লকড়ি দিয়ে পিটতে পিটতে মেরেই ফেলতো। বাইরে থেকে লোকজন ডেকে এনে দাদিমা বাঁচায় ছেলেকে। অত মারলে কি ছেলেপুলে ভাল হয়? বিগড়ে যায়। তাই তো হল। ওই মাস্টার দিদিমনির বেটি, ওটা বিরজুকে নিয়ে গায়েব! সব্বাই বিরজুকেই দোষ দিল। কেউ বলল না এ সব মাস্টার দিদির কারসাজি, নিজের বেটিকে লাগিয়ে দিল আমার এই ভোলেভালা বিরজুর পিছে। কি আছে ওই পেতনিটার? লিখাপঢ়ি আর চামড়াটা সাদা ব্যস্। দাদাজির এতো এতোটাকা তিনভাগ হল। রামপরসাদেরটা কতগুণ গেড়ে গেল। কেন? ও কখখনো বউয়ের কথা শুনবে না। 'অপনা দিমাগ' যেটা বুঝবে ভাল সেটাই করছে, আর বিরজু? বউ যা বলবে তাই। বউ বলছে তোর মা খারাপ, তো মা খারাপ!

রাস্তায় এখন আর লোক নেই। দু'পাশের দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

শুধু কতগুলো কুকুর এখানে ওখানে হোউ ভোউ করে চলেছে। বাবুজির বুঝি চোখ লেগে গেল! দু-একবার টলে পড়ে যেত নাকি, ঠেলাটা ধরে সামলে নিয়েছে। ভারি গলায় বলে 'দেখকে চল।' আজ যেন বাবুজির কিছু ঠাণ্ডা মেজাজ। অনেকসময় তাসের বাজি জিতে গেল তো এমনি শরীফ মেজাজ, কেনা কাটার ধুম লেগে যেত! দু'হাতে মেলা কিছু নিয়ে ফিরতো—মাংস পরাঠা কি আনাজ, মাছ। আজ মনে হয় জেব বিলকুল 'ঠণ্ডা'।

পানজাবি ঢাবাটা সারারাতই খোলা। চমৎকার মাংস রান্নার গন্ধ! কতকাল যে মাংস কেন, এক টুকরো মাছ কি আধখানা ডিমও জোটেনি তাদের। বাবুজি কখনো বাইরে খায়। কি খায় ওরা তো জানতে পারে না।

বাবুজির রইস ক'জন দোস্ত আছে তারা কেউ ঠিকেদার, কেউ দোকানদার—কিরানা ব্যবসা।

বাড়ির বড়-ফটকে এসে ঠেলাটা নিয়ে ও চলে যায় পেছনে। ঠেলাটা ঢুকিয়ে ভেতরের সব জিনিসপত্র বার করে নিয়ে যাবে রান্নাঘরে। বাবুজি গেল অন্য পথে। বড়বাবুর বারান্দার সামনে যাবে না। পাশের ছোট দরজা দিয়ে চলে যাবে তাদের শোবার ঘরে, তারপরেই শুরু হবে! ও রান্নাঘরে ঢুকতে মা তাকিয়ে আছে। এই তাকানোটার মানে জানে। পকেটের ময়লা নোট রেজকিগুলে মার হাতে তুলে দিতে মা—'ব্যস! হো গিয়া? দু'শ টাকার মাল নিয়ে গেলি এখন দিলি একশতিরিশটাকা পঞ্চাশ! মাল কোথায়?' কি বলবে ও? কোনোরকমে বলে 'বাবুজি তিনশ পচ্চিসটাকা নিয়ে গেল।' 'আর খুব দারু টেনে ফিরল। আজকে ঘরে আর একদানা গেঁহু নাই। কালকে খালি ঠেলা নিয়ে যাবি তোরা। রোজ রোজ ওই জুয়া আর দারু। আমি আর পারছি নারে। বলতে বলতে মা উঠে দাঁড়িয়েছে, মার দু'চোখ গড়িয়ে জল পড়ছে। মা যাচ্ছে বাবুজিকে ধরবে। তারপরে কি হবে ও জানে। ও আর দাঁড়ায় না, সো—জা দাদির ঘরে। গিয়েই দাদির পাশে শুয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে। 'কুছ খায়িল?' ও জবাব দেয় না। নানি ওঠার চেষ্টা করে ' যা উধর দেখ্ রোটি রক্খি, সবজি নাহিল। দাল হোগা। খা লে।' ও নড়ে না। দাদি এবার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। 'কা রে? কা হইন?'

—বাবুজি সব রুপিয়া লে গিয়া। সব খতম করকে আয়া। একটাকাও ফেরেনি মনে হয়।'

—ফেরেনি তো ফেরে নি। আমি কি করবো ম্য কা করে!'

দাদি যে কিছু করবে না, মার হয়ে একটা কথাও বলবে না এতো জানা। মাও তো না

খেয়ে বসে আছে। হয়তো রুকিয়াকে খাইয়ে নিজে এক লোটা জল পেটে দিয়ে বসে—সে বাজার থেকে আনাজ আনবে তবে তো রান্না বসাবে যদি না বড়িমার কাছ থেকে মা আবার কিছু 'ধার' নিয়ে এসে রান্না করে থাকে। ধার তো ধার-ই থাকে, শোধ আর কোনোদিনই হয় না হবেও না।

কিন্তু আজ আর কোনো চ্যাঁচামিচি কান্না শোনা যায় না। দাদির রুটি ক'টার মাঝে বেশ খানিকটা ডাল ঢেলে নিল। তারপর গোল পাকিয়ে এক ছুট ঘরের দিকে। রুকিয়া খেয়ে থাকলে এ চার খানা চাপাটি সে আর মা ভাগ করে খেয়ে নেবে।

কিন্তু তাদের ঘর অন্যদিনের মত অন্ধকার নয়। বাতি জ্বলছে! বাতি! এ সময়!

বাবুজি মেঝেয় ওপর উবু হয়ে পড়ে। মা কি সব নিয়ে পিঠে কাঁধে কোথায় কোথায় লাগাচ্ছে। সারা পিঠে লম্বা লম্বা কয়েকটা দাগ। এই প্রথম বাবুজির দিকে ভাল করে তাকাল। শুধু পিঠে নয় কপালে গালেও কাটা দাগ, রক্ত জমে আছে নাকি! বাবুজিকে এরকম মারল কে?

মা ফিস্‌ফিস্ করে বলে 'যা বড়িমার কাছ থেকে ব্যাথা-দর্দের বড়ি নিয়ে আয় দু'টো। বলিস আমার জন্যে।'

মা বুঝি পোড়া তেল আর মবিল লাগাচ্ছে বাবুজির ঘাড়ে পিঠে।

'কি হয়েছে?' কোনোরকমে উচ্চারণ করে ও।

—'তুই কিছু জানিস না?' ও মাথা নাড়ে।

—'ইনকা দোস্ত লোগোনে দোস্তি নিভায়া। বন্ধুরা সবাই মিলে পিটিয়েছে। টাকা আদায় হচ্ছে না। বাকিতে কি জুয়া চলে! দ্যাখ এবার যদি বন্ধ হয় জুয়ো। তাহলে দুটো খেতে পাবি তোরা।' বাবুজি মাথা তুলছে মা'র হাত ধরে ভেজা গলায় বলছে—'তেরি কসম! কিষাণকি কসম। কভি নেহি! কভি নেহি!.....

বাবুজি ওর দিকে হাত বাড়িয়েছিল। মা চট করে বাবুজির হাতটা সরিয়ে দেয় 'ঝুট্ কাহিঁকা! কিষাণকে ধরে আর মিছে দিব্যি করতে হবে না। কাল বিকরির টাকা নিয়ে বাড়ি এসো তো, বুঝবো!

বাবুজি কি কাঁদছে? বাবুজি কাঁদছে!!

টাইমবাবু

বদিউর রহমান

তপন ভট্টাচাজ্জির পিতৃদত্ত নামটা প্রায় সকলেই ভুলে গিয়েছেন। উনি আমাদের পাড়ায় 'টাইমবাবু' নামেই পরিচিত। আমাদের বাসডিপোর 'স্টার্টার' হিসেবে তপনবাবু কুড়ি-একুশ বছর বয়সে ওই কাজে যোগ দেন। আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকে তাঁকে বাসডিপোর চার-বাই-চার আর উচ্চতায় সাড়েপাঁচ ফুট কাঠের তৈরি গুমটিঘরে বসে থাকতে দেখেছি। যখন মর্নিংকলেজে ছ'টার বাস ধরতাম তখনও যথারীতি তপনবাবুকে ঐ ছোট পরিসরের খুপরিতে জানালার পিছনে বসে নিজের কাজ করতে দেখেছি। ততদিনে জানতে পেরেছিলাম উনি আমাদের বাসডিপোর চারটে রুটের একমাত্র 'স্টার্টার'।

ওঁর কাজ ছিল কখন কোন বাস ছাড়বে তা ঠিক করা। বাস ছাড়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের পাঁচমিনিট আগে একবার হুইসল বাজিয়ে ড্রাইভার-কন্ডাক্টরদের সতর্ক করতেন। আবার ঠিক পাঁচমিনিট পরে বাসটাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আরেকবার হুইসল বাজাতেন। ঐ সব ব্যাপারগুলো এত চমৎকারভাবে সময় ধরে করতেন যে কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওনার নাম হয়ে যায় 'টাইমবাবু'।

দীর্ঘদিন আমাদের ডিপো থেকে বাস ধরার সুবাদে টাইমবাবুর সাথে কিঞ্চিৎ পরিচয় হয়েছিল। ছাত্রজীবনে শীত-বর্ষায় কখনো কখনো ছ'টার বাসটা ধরতে পারতাম না। টাইমবাবুর কাছে পরবর্তী বাসটার কথা জিজ্ঞাসা করলে তার ছাড়ার সময় ও গাড়ির নাম্বার বলার পর কখনো কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কলেজ, পড়াশোনা ইত্যাদি সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্নও করতেন। দু'একবার সময় সম্পর্কে প্রচ্ছন্নভাবে সচেতন হতে বলেছেন। বয়স কম ছিল; সময়ানুবর্তিতার অযাচিত উপদেশে কখনো কখনো বিরক্ত হতাম। ছাত্রজীবন অতিক্রান্ত করে শিক্ষকতা করার সময়ও দীর্ঘদিন টাইমবাবুকে তাঁর কর্মে নিষ্ঠার সঙ্গে গুমটির মধ্যে বসে দায়িত্ব সম্পন্ন করতে দেখেছি। চোখাচোখি হলে হেসে বলতেন 'ভাল থেকো'। ততদিনে ওকে অতীব সদাশয় শিষ্ট ব্যক্তি বলে প্রত্যয় জন্মেছিল।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সবসময় টাইমবাবুকে দেখতাম নিজের কাজ সকাল ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে। ভোরে স্নান ও প্রাতঃরাশ সেরে পৌনেছ'টায়

বাড়ি থেকে বের হতেন, ফিরতেন রাত সাড়েআটটার আগে নয়। ওঁর দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ। চারটে রুটের চব্বিশটা গাড়ির সময় অনুযায়ী আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখতেন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। বলতেন যে, সবকিছু সময় অনুযায়ী না চললে বহু মানুষের প্রয়োজনীয় কাজ বানচাল হয়ে যেতে পারে; ছাত্রদের স্কুল-কলেজ দেরি হতে পারে; কর্মচারীদের আপিসে আর মহিলা ও বাচ্চাদের বা অসুস্থ ব্যক্তিদের অহেতুক দুর্গতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই কোনো রুটের বাস হঠাৎ খারাপ হলে উনি ব্যক্তিগতভাবে তৎপর হয়ে সময়-সারণী অনুযায়ী অন্য বাস ছাড়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতেন দক্ষতার সঙ্গে। কিছু ফাঁকিবাজ বাসকর্মচারী ঐ রকম সুশৃঙ্খল অথচ আপোষহীন ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য টাইমবাবুর বিরুদ্ধে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ত না। রসিকতা করে বলতো, ''বেটা নিজেকে মনে করে বিশ্বকর্মা! জগৎ সংসারের সব দায়-দায়িত্ব যেন ওর ঘাড়ে।'' আমাদের ডিপোর সুষ্ঠু পরিষেবার পিছনে যে ঐ রকম একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিরলস প্রয়াসের ভূমিকা আছে তা অনেকে ভেবে দেখতেন না। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ অবলীলায় ত্যাগ করে কর্মজীবনের দায়িত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার আদর্শ মানুষটা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে থেকে গেছেন অথচ তাঁর কাজের সুফল আমরা নিয়মিত ভোগ করেছি। ঐ রকম নিষ্ঠাবান মানুষটাকে কখনো ভুলেও ধন্যবাদজ্ঞাপন করার প্রয়োজন মনে করিনি। ঐ জাতীয় কাজগুলো তো সাধারণত 'থ্যাঙ্কলেস্ জব'!

টাইমবাবুর কাজ উল্লেখযোগ্য চাকরির মধ্যে গণ্য না হতে পারে কিন্তু মানুষের যাত্রাপথের পরিষেবাকে মসৃণ, সুনিশ্চিত ও সুশৃঙ্খল করার পিছনে তাঁর করণীয় কাজটা তপনবাবু দীর্ঘ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর দৃষ্টান্তমূলকভাবে করে গেছেন। সকালে ডিপোয় পৌঁছান আর রাতে ফেরেন। দুপুরের খাবার কর্মজীবনে বাড়িতে গ্রহণ করেন নি। দুপুরের দিকে বাসের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম থাকে বলে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে বাড়ি থেকে পাঠানো টিফিনবক্সের ভাতটা খেয়ে নিয়ে আবার পরিষেবার দিকে মনোনিবেশ করতেন। ঐ রকম নিষ্ঠাবান কর্মীর জীবনে সংসারধর্ম সচারুভাবে করা হয় না। টাইমবাবুর পক্ষেও তা যথাযথভাবে করা সম্ভব হয়নি। প্রতিমাসের টাকাটা স্ত্রী মালতি'র হাতে তুলে দিতেন। ঘরসংসারের সব দায়-দায়িত্ব তিনিই সামলাতেন। একটা ছেলে। তাকে স্কুলে ভর্তি করার সময় টাইমবাবু তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তার পঠনপাঠন, অগ্রগতি, উন্নতি, অবনতি কোনো কিছু লক্ষ্য করার জন্য সময় দিতে পারেননি। দেখা পেলে মাঝেমধ্যে তাকে বলতেন, ''বাবা, সব কাজ সময়মত করবে, সময়ের অপচয় করবে না—সময়ের যথাযথ ব্যবহার করবে। এখন তোমার ছাত্রজীবন; পড়াশোনাটাই তোমার একমাত্র ব্রত।''

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে বৎসরের পর বৎসর চলে যায়। টাইমবাবু

ছেলে হিরার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমতে থাকে। টাইমবাবুর কাজে যাওয়ার সময় হিরা থাকে বিছানায় ঘুমিয়ে। রাত্রে ফেরার কিছুক্ষণ পর খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানা গ্রহণ করার সময় স্ত্রীকে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর পেতেন, ''প্রাইভেট ট্যুইশনে গেছে; আসবেখন।''

দীর্ঘদিন এভাবেই চলছিল। বহুদিন পর টাইমবাবু জানতে পারেন ছেলের অনেক বখাটে বন্ধুবান্ধব ও সাঙ্গোপাঙ্গো। হিরা নাকি তাদের মধ্যমণি। তাদের কাছে টাইমবাবুর ছেলে হিরা থেকে হিরো। স্বাভাবিকভাবেই তার লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। হিরা বাবাকে এড়িয়ে চলে। সে নাকি বাবার দায়িত্ববোধকে তাচ্ছিল্য করে বলে, ''উনি সময়ের পূজারী; সময় আর সময়ানুবর্তিতার মালা জপতে জপতে মনে হচ্ছে উনি কালজয়ী হবেন।'' হিরার বিশ্বাস যেহেতু তার বাবা নিজের সংসারের প্রতি নজর দেন নি তাই ঐ রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবার জন্যই হিরার জীবনটা আজ বিফল। শুধু তার জীবনটা কেন! ওর বিশ্বাস ঐ রকম নীতিবাগীশ কর্মী হতে গিয়ে তার মায়ের জীবনটাও বাবাই ব্যর্থ করে ছাড়ল। চাকরিতে দায়িত্ববোধের আতিশয্যে যে লোক পারিবারিক, সামাজিক কোনো কাজে-কর্মে নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকল না—যে কোনদিন মায়ের সুখ-দুঃখ দেখল না—সে আবার বাবা কিসের?

টাইমবাবুর স্ত্রী মালতী অন্য প্রকৃতির। আজীবন কর্মপাগল স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি। তাঁর কোন অনুযোগও ছিল না। তিনি একটু চাপা স্বভাবের। সকাল থেকে সংসারের কাজগুলো যথারীতি করে যেতেন নিঃশব্দে। বিয়ের পর দু-একবার সুখদুঃখের কথা স্বামীকে বলতে গিয়ে বুঝে গিয়েছিলেন টাইমবাবু মানুষটা অন্য ধাতের। কর্মস্থলের দায়িত্ব পালন করাকেই উনি জীবনের মুখ্যব্রত বলে বিশ্বাস করেন আর সংসারধর্মটা তাঁর কাছে একেবারেই গৌণ।

টাইমবাবুর কাছে নিজের সংসারের থেকে বিশ্বসংসারের পরিসর আরও বিস্তৃত, আরও গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনেই ব্যক্তি ও পরিবারের কল্যাণ নিহিত। তাই টাইমবাবুর কাজ যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, ওঁর দৃষ্টিতে তা ছিল মানুষের জীবনযাত্রার পথকে সুশৃঙ্খলভাবে সচল রাখার পরিষেবা—যার উনি একজন অতীব সাধারণ কাণ্ডারী। তাই ডিউটির দ্বারা জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে নিজের সংসারকে একটু বেশি মাত্রায় উপেক্ষা করে ফেলেছিলেন। সফল মানুষ জনের মতো সংসারজগৎ আর কর্মজগতের মধ্যে সমান ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হননি। অথচ টাইমবাবু এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারেন নি। জগতসংসারে এরকম কিছু মানুষ

থাকে যারা কাজপাগল। মুষ্টিমেয় ঐ রকম কিছু মানুষের জন্য বিশ্বসংসারের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। আশ্চর্য হতে হয় ঐ লোকেরাই থাকে পাদপ্রদীপের আড়ালে। অবশ্য আমাদের টাইমবাবুর তার জন্য কোন আক্ষেপ নেই। উনি সবার অলক্ষ্যে নিজের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেই তৃপ্ত।

টাইমবাবু সেদিনও যথারীতি ডিপোতে গিয়েছিলেন। দশটার দিকে বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক দু'চার কথার পর ইংরাজিতে টাইপ করা একটা চিঠি ওঁর হাতে তুলে দিলেন। পুরোনো দিনের আই.এ. পড়া টাইমবাবু সেটা পড়ে অবগত হলেন যে তিনমাস পর আগামী 30 নভেম্বর তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার দিন। চিঠিটার মর্ম উদ্ধার করা সত্ত্বেও টাইমবাবুর মধ্যে বাহ্যিক কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। ওনার আশ্চর্যরকম নীরোগ শরীরে প্রতিদিনের মতো তখনও প্রশান্তি বিরাজ করাছিল।

সিন্ডিকেট কর্তারা তাঁকে জানালেন, ''বেশিদিন সময় নেই বলে কাল থেকে একটা ছেলে—অবিনাশ মজুমদার—আপনার কাছে আসবে। তাকে কাজগুলো শিখিয়ে পড়িয়ে দেবেন।'' সবশেষে তাঁরা আরও একটা কথা বললেন, সিন্ডিকেটের তরফ থেকে পয়লা ডিসেম্বর বেলা দশটায় আপনার বিদায়সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় উপস্থিত থাকবেন।''

সব শুনে টাইমবাবু অবিচলভাবে বললেন, ''অবিনাশ আসবে সে তো ভাল কথা। তাকে আমি সব বুঝিয়ে শিখিয়ে দেবখন। কোন অসুবিধা হবে না। আর বিদায় সভা করার কী প্রয়োজন ছিল! না করলেও পারতেন।'' সিন্ডিকেট সম্পাদক বিনীতভাবে বললেন, ''তা কি হয়! আপনি যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাজ করেছেন তাঁর জন্য আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধা দেবেন না। পয়লা ডিসেম্বর দশ'টার সময় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।'' তারপর তাঁরা নমস্কার বিনিময় করে চলে গেলেন।

পরের দিন টাইমবাবু সকাল থেকেই উদগ্রীব হয়ে ছিলেন অবিনাশের আগমনের আশায়। বহুদিনের কর্মজীবনের সঙ্গী 'ফেভার ল্যুবা' টেবিল ঘড়িটায় বার বার সময় দেখছিলেন অবিনাশের আসার কথা ভাবতে ভাবতে। দুপুর দু'টোর পর টাইমবাবুর সামনে নমস্কার করে দাঁড়াল একটা যুবক। বলল, 'আমি অবিনাশ'। টাইমবাবু তাকে সাদরে কাছে ডেকে সেই ছোট্ট কাঠের গুমটির মধ্যে বসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। টাইমবাবু অবিনাশকে বললেন, ''বাবা, জীবনে যে কাজই কর তা মনপ্রাণ দিয়ে করবে। আর তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবে। আমাদের স্টার্টারের কাজে সময়ানুবর্তিতা বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন আগেভাগে ডিপোয় পৌঁছান নিশ্চিত করবে। আরেকটা কথা, কাজের সময় নিজের জায়গা অর্থাৎ এই গুমটি ছেড়ে কোথাও যাবে না। পরের দিনের বাস চলাচলের সময়সারণীটা আগের দিনে সময় থাকতে করে রাখবে।" আরও কয়েকটা কাজের কথা অবিনাশকে টাইমবাবু বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেন অবিনাশ বেশ অন্যমনস্ক এমনকি অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে বলে উঠল, ''ঠিক আছে কাকাবাবু, আপনার কাছে পরে সব শিখে নেবখন। আর এই নগণ্য ব্যাপারগুলো আমি এমনিতেই করতে পারব। কলেজের ডিগ্রীগুলো কি আর আমাকে মুখ দেখে দিয়েছে!"

কথাবার্তা চলাকালীন অবিনাশের মোবাইল বেজে ওঠে। জিন্স প্যান্টের পকেট থেকে ফোনটা বের করে সে কথা বলতে আরম্ভ করল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর ব্যক্তিগত কথাগুলো টাইমবাবুর কানে আসাছিল। যেমন, ''হ্যাঁ বল, একটু আমাকে সামলে দিতে হবে। কী আর করি বল? তা তোরা এখন চাঁদুর রেস্টুরেন্টে তো? কী, শেফালী পৌঁছে গেছে? ঠিক আছে তোরা অপেক্ষা কর আমি বাচ্চুর বাইকে এখনই যাচ্ছি। তাহলে ছাড়লাম!!" কথা শেষ হওয়া মাত্র মোবাইল শুদ্ধু হাতদুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে অবিনাশ টাইমবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে চলে গেল।

অবিনাশ ডিপোয় মাঝেমধ্যে ধূমকেতুর মত আসে। সময়ে আসাযাওয়ার ধার ধারে না। বলে, ''এখন তো টাইমবাবু কাজটা চালিয়ে দিচ্ছে; সমস্যার কী আছে?" আর কাজ শেখার ব্যাপারে ওর মন্তব্য, ''স্টার্টারের কাজ আবার কোনো কাজ নাকি! ফুহ! তা আবার শিখতে লাগে?"

অবিনাশ সাধারণত কারও বাইকের পিছনে বসে ডিপোয় আসে। দু'চারবার নিজেই বাইক চালিয়ে এসেছে। একদিন বাইকের পিছনে একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সেদিন ওর চোখে ছিল রোদচশমা। কাঠের গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা সিগারেটের জ্বলন্ত বড় অংশটা চক্‌চকে জুতো দিয়ে চেপে দিয়ে বাইকের পিছনে মেয়েটাকে বসিয়ে হাওয়ার বেগে চলে গিয়েছিল তাই টাইমবাবুর অস্বস্তিটা প্রলম্বিত হয়নি। অন্যদিন অবিনাশ ডিপোয় আসার পর থেকে দু'চার মিনিট পর পর তার মোবাইল বেজে ওঠে। তাই তাকে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অথবা বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধান করতে চলে যেতে হয়। টাইমবাবুকে ও থোড়াই কেয়ার করে!

এইভাবে নভেম্বর মাস অতিক্রান্ত হল। পয়লা ডিসেম্বর সকালেও টাইমবাবু যথারীতি স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরে ছ'টার আগে ডিপোয় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন। স্ত্রী মালতী খাবার জলের বালতি নিয়ে বাইরে থেকে ফেরার সময় টাইমবাবুকে

বের হতে দেখে বললেন, ''আজ থেকে তুমি তো অবসরপ্রাপ্ত। এখন তোমার অফিস আর তোমার নেই। যে কাজের দায়িত্ব এতদিন তোমার ছিল সে তো আর তোমার নয়। এখন কেন ডিপোয় যাবে? যেতে হবে না।" টাইমবাবু মালতীর কথার যৌক্তিকতা মনে মনে স্বীকার করলেও বললেন, ''তা ঠিক বলেছ! কিন্তু ঐ কমবয়সী অবিনাশের সময়জ্ঞান নেই; তাছাড়া ও নানাবিধ সামাজিক কাজে এত ব্যস্ত থাকে দেখি যে যাত্রী পরিষেবার কথা ভেবে চিন্তা হয়। ধৈর্যসহকারে ও সময়ানুযায়ী অবিনাশ সব করতে পারছে কিনা ভাবছিলাম। তাই ভাবলাম ঘরে শুয়ে বসে না থেকে ডিপোতেই যাই। ওকে একটু সাহায্য করি।"

মালতী চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, ''না, আজ তুমি এখন ওখানে যাবে না। ওরা দশটায় বিদায় সভার জন্য ডেকেছে। তখন যাবে। বিয়ের পর থেকে আজীবন কখনো কোনদিন তোমায় কোন অনুরোধ করিনি—আজকে আমার একটা কথা রাখ। আমার কাছে দু'দণ্ড বস। এখন যেয়ো না।

টাইমবাবু আজ প্রথম মালতীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। বারান্দার নড়বড়ে চেয়াটায় বসে পড়লেন। বহুদিন পর মালতীর মুখটা প্রাণভরে দেখছিলেন। বাধ্য ছেলের মতো ওর কথা আজ টাইমবাবু শুনেছেন দেখে মালতীর মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আজ মালতী রান্নার বিশাল আয়োজন করেছে। মনপ্রাণ ঢেলে রান্না করতে করতে মালতী টাইমবাবুর দিকে ফিরে বললেন, ''আজ তোমার জন্য মাংস করছি। বহুকাল পর আজ আমরা একসঙ্গে দুপুরে ভাত খাব। সপ্তাহান্তের ছুটির দিনেও কাজে চলে যেতে; অন্যান্য পাওনা ছুটির ব্যাপারে তো বলতে ছুটি পাওনা আছে বলে কি অযথা ছুটি নিয়ে বসে থাকতে হবে? তাই কখনো দুপুরের খাবার একসঙ্গে খাওয়া হয়নি। আজ যেন আমার কথার অন্যথা না হয়। বিদায় সভা থেকে যথা সম্ভব শীঘ্র ফিরবে।"

ছোট্ট একটা 'আচ্ছা' বলে টাইমবাবু মালতীর অলক্ষ্যে তাকে দেখতে থাকলেন। আজই প্রথম মনে হল বিয়ের পর মালতীকে যেরকম সুন্দর দেখাত এখন তো আর অত সুন্দর নেই। মাথার চুলের গোছাটার এখন কী শ্রীহীন হয়েছে! ইতিমধ্যে চুলগুলো ধূসরবর্ণের কবে হল! টাইমবাবু ভাবলেন এতদিন তো এসব তো লক্ষ্য করা হয়নি! বড় ভুল হয়ে গেছে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। হঠাৎ মনে হল অবিনাশ সব সামলাতে পারছে তো? টাইমবাবু বুকপকেটে চেন দেওয়া ঘড়িটা একবার বের করে দেখলেন। বাজছে ন'টা। ডিপোয় যাওয়ার কথা ভাবছিলেন এমন সময় মালতী এককাপ চা নিয়ে হাজির। বললেন, ''ধীরে সুস্থে চা-টা খাও, তারপর ডিপোয় যেও।"

মালতীর আজ আনন্দ ধরে না। টাইমবাবু তাঁর প্রতিটি কথা রাখছেন। তিনি আবার

রান্না করার জন্য ওঘর থেকে চলে গেলেন। এসময় এককাপ চা চিন্টু প্রতিদিন গুমটিতে দিয়ে যেত। ঐ চা-টা প্রায়শই বিস্বাদ লাগত। মালতীর হাতের তৈরি আজকেরটা যেন অমৃত মনে হল। চা থেকে চিন্টু আর ডিপোর কথা মনে উদয় হল। তার সঙ্গে অবিনাশের কথা। ছেলেটা সব সামালাতে পারছে তো? পরিষেবার এই সময়টা সব থেকে বেশি ব্যস্ততার। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে চারটে রুটের গাড়ি ছাড়ার ব্যাপার থাকে। বুক পকেট থেকে চেন দেওয়া ঘড়িটা ক্ষিপ্র হাতে বের করে দেখলেন, দশটা বাজতে দশ। নাঃ আর বসে থাকার সময় নেই। ডিপোর দিকে যাওয়ার জন্য টাইমবাবু উঠে দাঁড়াতে উপলব্ধি করলেন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ধপাস করে বসতে বাধ্য হলেন। বুকের বাঁদিকটা কীরকম করছে! কী অসহ্য যন্ত্রণা। ঘাড়ের, কাঁধে যন্ত্রণাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ডিসেম্বরে এতো ঘাম কেন! কেন এত অন্ধকার! বাতাসের অক্সিজেন এত অপ্রতুল!! টাইমবাবু আর কিছু জানেন না। বিছানা থেকে মেঝেয় পড়ে যাওয়ার আওয়াজে মালতী ঘরের মধ্যে ছুটে এসে দেখেন—সব শেষ। এমন সময় বাইরের দরজা থেকে হিরার ডাক, ''মা দেখ কে এসেছে।'' কোনক্রমে মাথা তুলে দেখেন দরজার কাছে হিরার সঙ্গে লাল শাড়িতে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে—তার সিঁথিতে সদ্য সিঁদুরের প্রলেপ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে সদ্য বিবাহিত। মা হিরাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন, ''হিরা তাড়াতাড়ি এঘরে আয়। তোর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'' ধীর পদক্ষেপে হিরা ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে বাবাকে মৃত দেখে বলে—''কী কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকরে বাবা! মরার আর সময় পেলনা। তোমাকে আজকের দিনেই মরতে হলো!! সময়জ্ঞানের বলিহারি!!''

অরুণ কুমার সরকারের দুটো কবিতা

এক

জীবন যেমন

হাটের নিজস্ব শব্দের গায়ে
পচা ভাতের গন্ধ
অসংলগ্ন হয়ে ওঠে বৈশাখী বাতাস
ঢলে পড়া সূর্যের মতো
ক্লান্ত দু'চোখ
শিশুসন্ধ্যার গায়ে
অন্য স্বপ্ন-নেশা
ক্লান্তির বিসর্জনে কাছে টানে
দখলের শরীর
ভাঙা চাঁদ-জোছনায়
ভিজে ওঠে
অভাবি সংসার...

দুই

যাপন

এখানেও বদলায় ঋতু
নিত্য ফুটে ওঠে যাপনের জলছবি
বেপরোয়া বেহিসাবী মনোভাব
ওড়ে রঙিন এলোচুল
যান্ত্রিক দুটি কান
ঘন ঘন রিচার্জড হয় জীবন
চিপসের জ্যালজেলে প্যাকেটের মতো
উড়ছে সব
নিঘুম শহরে লক্ষ আলোর ঝলকানি
সে আলো গায়ে মাখে
কোনো বনেদী বাড়ির বউ
ডুকরে কেঁদে ওঠে
অতুলপ্রসাদী সুর।

সৌভিক দত্তের দুটো কবিতা

এক

শঙ্খচিল

কোথাও উচুঁনীচু, কোথাও সমতল
কোথাও বসতি, কোথাও জঙ্গল
বুক চিরে যায় কাঁটাতার
ভাগ হয়ে গেছে দুই দেশ
আর বিভক্ত অধিকার।

তবু
এপারের গরু ওপারের হাটে
এপারের ছুরি ওপারের গেটে
এপারের জাল নোট সহজেই
ওপারের হাতে হাতে ঘোরে
এপারের রটনা অনায়াসে
ওপারের মুখে মুখে ওড়ে

সব গলে যায় কাঁটাতার দিয়ে
শুধু মানবতাটুকু ছাড়া
এদেশ আমার!
ও দেশ তোমার!
গুলির শব্দ—
পড়ে থাকে ভাত বাড়া!!

দুই

দুঃখ

তুমি যদি দুঃখ গোলাপ দাও
আমি কাব্য ঘ্রাণ দেবো!
কোন শৌখিন বাগানের ফুল
এনে দিতে চাইনি তোমার পদ্ম
হস্তে,
কখনও বিশ্বাস হয়নি হীরকদ্যুতি
আরো কিছু মোহময় করবে
ওই মরাল গ্রীবাকে
কোনো পদাতিক মুহূর্তে তোমাকে
স্থাপন করতে ইচ্ছে করেনি,
কোন প্রস্তর প্রাসাদে
তোমার উৎসুক চোখে

আমন্ত্রণ পত্র পড়তে পারিনি
স্বেচ্ছা নিরক্ষরতায়
তুমি আমাকে দুঃখ বারি দাও
আমি তোমাকে কাব্যস্নান দেবো!

শেলি চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা

এক

রাত্রি আশা

কখনো এমন হয়—কত কত দিন পরে
সমস্ত আকাশ আকাশের রাত
লুটপাট করে নেয় জোনাকি-তারারা
কালো ঘনমেঘ ঝড়
কিচ্ছু মানে না।

আবার কখনো হলে
চুপচাপ চলে যাবো ছাতে
বুকের দরজা হাটখুলে—যদি নেমে আসে
অনেক তারার আকাশ বুকে ভরে নিয়ে
এক বিপুল রাত্রি হয়ে যাবো!

দুই

বসন্ত!

সারারাত।
সারারাত কেঁদে কেঁদে শিশির মরেছে!
এই ভোরে কাঁটাগুলো কুঁড়ি হয়ে ফোটে,
এত ফুল!
মনেবনে দেহকোণে বসন্ত এখন!

তিন

মনিব্যাগ

মনিব্যাগ নয়। ভ্যানিটির তলে পড়ে এইটুকু,
খুচরো কয়েকটাকা।

তাই নিয়ে স্পর্ধা জীবন,
মে-ব্যাক জাগুয়ার স্কোডা
রেসর্ট নিবাস স্পা জাকুজি বিলাস
নেহাত কয়েকটা টোকা
লিঙ্ক খুলে যাবে।
যাদুই-চিরাগ বুকে, ঠোঁটের কোণায়
সামান্য হাসির আলো শুধু জ্বেলে রাখা।

সুগত চৌধুরী
শৈশব প্রসঙ্গে

বিভূতিভূষণের অপু যদি প্রকৃতির সন্তান হয়
তবে অপ্রাকৃতিক সন্তান ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন।
আজকের শিশুদের কল্পনায় ভাসতে দিন,
প্রকৃতির সাথে মিশতে দিন,
কল্পনার অবাধ আকাশে মন-পাখিকে উড়তে দিন
পড়তে দিন ঠাকুরমার ঝুলি, আরব্য-রজনী, ক্ষীরের পুতুল।
কল্পনা ছাড়া কি বিজ্ঞানের আবিষ্কার হতে পারে!
নতুন সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে!
বন্ধনের মধ্যে মুক্তির সুর আনতে পারে!
অন্ধকার জীবন তো তাকে হাতছানি দেবেই।
না পাওয়ার দগ্ধতায় যন্ত্রণা আসবেই।
কান পাতুন রেল লাইনে
দেখবেন, কাশ ফুলের বন, পাখিদের হাতছানি, ঢাকের বোল,
প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর আধুনিকতা। সব মিলেমিশে একাকার।
জীবনে উষ্ণতা আর সরলতার রোদ তো এনেই দিয়েছে।
হৃদয় বীণায় জীবন তরীর সুরটা বেজে ওঠা বাকি।

রবি রায়

মা ও আগুন

তুমি আমায় স্তন্য দিলে, অন্ন দিলে মা
মুখে আমার ভাষা, চোখে স্বপ্ন দিলে মা
দিলে আমায় জন্ম-ঋণের নির্ধারিত শ্লোক
আলোয় করে উদ্ভাসিত ভূর্ভুবস্বঃ লোক
আমি তোমায় কিছুই দিলাম না
মুখে শুধু আগুন দিলাম মা!

আগুন আমার রক্তে আগুন কামে ক্রোধে
আগুন আমার পাঁজর জ্বালায় আগুন প্রতিরোধে
আগুন আমার প্রতিবাদে, আগুন অহংকারে
আগুন আমায় সব কিছু দেয়, আগুনই সব কাড়ে।

সেই আগুনে সমিধ জ্বেলে মন্ত্র পড়ে মা
শরীর ধু ধু জ্বালিয়ে দিলাম—সময় পোড়ে না!

কৌশিক দাশগুপ্ত

নিসর্গ

সুন্দর এক পর্বতেরই কোলে
একটি শিশু পাকদন্ডীর পথে
ক্যানভাসেতে শিল্পী এঁকে যান
মূর্ত করে নিসর্গ আত্মাকে।

অবলুপ্তপ্রায় পার্সী সম্প্রদায় এবং ভারতের প্রগতিতে তাদের অবদান

প্রণবকুমার দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল)

পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতবর্ষে 120 কোটিরও বেশি লোকের বাস। আমাদের দেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকরাও ভারতের অধিবাসী। যেমন মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী, ইহুদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষে পার্সীরা দেশের জনসংখ্যার 0.007 শতাংশের মতো কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল যে এদের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। এই নিবন্ধে আমরা পার্সীদের নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

পার্সীরা দশম খ্রিস্টাব্দে আরবদের অত্যাচারে ইরান বা (Persia) থেকে ভারতবর্ষে চলে আসে। এই সম্প্রদায়ের ভাবগুরুর নাম ছিল জরথুষ্ট্র এবং এই ধর্মাবলম্বীদেরই আজ পার্সী বা জরোস্ট্রিয়ান (Zoroastrian) বলা হয়ে থাকে, এই ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে একটি। তথ্যানুসারে জানা যায় যে, বিশ্বের নানা দেশে সর্বসাকুল্যে মাত্র একলক্ষ পার্সী ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। পার্সীরা ভারতবর্ষে এসে প্রথমে গুজরাটের নভসিরি ও সুরাট অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রের মুম্বাই ও পুনেতে বাস করতে আরম্ভ করে। এখন সর্বাধিক পার্সী বাস করে মুম্বাই শহরে এবং তার আশে-পাশে। পার্সী পঞ্চায়েতের পরিসংখ্যান অনুসারে দিল্লীতে 2009 সালে প্রায় আড়াইশ জন পার্সী ছিল। কলকাতাতে প্রায় পাঁচশ মতো পার্সী আছে। ময়দানে Calcutta Parsee Club আছে।

1991 সালের Census অনুসারে ভারতবর্ষে পার্সীদের জনসংখ্যা ছিল 76,382 এবং তার মধ্যে 53,794 জন বাস করত মুম্বাই শহরে। 2001 সালের রিপোর্টে পার্সীদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 60,601-য়ে এবং তারমধ্যে মুম্বাই নিবাসী ছিল 46,567 জন। আক্ষেপের বিষয় হোল যে 2011 সালের Census অনুসারে এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় 61,000-য়ে। জনসংখ্যা বিশারদরা বা Demographer-রা বলছে যে, গত দশ বছরে পার্সীদের জনসংখ্যা প্রায় 12 শতাংশ কমে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই হারে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকলে 2051 সালে পার্সীদের সংখ্যা 34,000 এর মতো এসে দাঁড়াবে। Demographer-রা আশঙ্কা করছেন যে, সামনের শতকের গোড়ার দিকে পার্সীদের সংখ্যা zero level বা শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছালেও অবাক হবার কিছু নেই। এই ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক নেতারা এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও খুব উদ্বিগ্ন।

পার্সীদের জনসংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পার্সী সমাজের অনেকেই অবিবাহিত থাকে। আর বিয়ে করলেও বেশি বয়সে করে। অনেক পার্সী পরিবারের সভ্যরা বিয়ে করতে চায়না কারণ তারা ভবিষ্যতে পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের দেখাশোনা করবে বলে। বিয়ের পর স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যদি চাকরি করে বা কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে—তারা অনেক সময় নিজেদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সন্তান-সন্ততি চায় না। তাছাড়া এই সম্প্রদায়ের কোন সভ্য নিজেদের সমাজের বাইরে জীবন সঙ্গী বেছে নিলে—তারা ধর্মচ্যুত হয়; অর্থাৎ তাদের ছেলেমেয়েরা আর পার্সী হিসাবে গণ্য হয় না। আমার নিজের দু'একজন পার্সী বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে এরা বেশি বয়সে বিয়ে করার পরেও ওরা family planning বা পরিবার পরিকল্পনাতে বিশ্বাস করে—অর্থাৎ একটা বা দু'টো সন্তানের বেশি ওরা ভাবতেই পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে টাটা কোম্পানির প্রাক্তন কর্ণধার রতন টাটা বিয়েই করেনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের প্রথম অধিকর্তা লেঃ জেনারেল মাস্টার অকৃতদার ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর সময় একজন সুন্দরী ও বিদূষী পার্সী ভদ্রমহিলা প্রফেসর নার্গিস সেধ্নার কাছে আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল; উনি ছিলেন অবিবাহিত। এয়ার মার্শাল দাতিসারা বিয়ে করেছিলেন ছেচল্লিশ বছর বয়সে। উনি ছিলেন চন্ডীগড়ে IAF-এ কমান্ডার।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে এবং পঞ্চাশ-ষাট দশকে পার্সীরা পাশ্চাত্য জগতের জীবনযাত্রা অনুসরণ করার চেষ্টা করত—সে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেই হোক বা জামাকাপড় পরার ব্যাপরেই হোক। পার্সীদের মাতৃভাষা গুজরাতি হলেও, নিজেদের মধ্যে ওরা ইংরেজিতেই বেশি কথা বলে।

আমরা জানি যে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতবর্ষের নানা ক্ষেত্রে দেশের প্রগতির জন্য পার্সীদের অবদান ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। এই ব্যাপারে বলা যায় যে, শিল্প ও বাণিজ্য বা শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক বা অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা বা লোকহিতকর কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই এই সম্প্রদায়ের অবদান অবিস্মরণীয়। পার্সীদের সবচেয়ে বড় অবদান হল অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা এবং শিল্পবাণিজ্যের জগতে। এখনও অবধি সবচেয়ে জনপ্রিয় পার্সী হিসাবে ভারতবাসীরা মনে রাখবে—জে. আর. ডি. টাটা (J.R.D. Tata) এবং ফিল্ড মার্শাল স্যাম্ মানেক্শ-কে।

এবার কয়েকজন কৃতী পার্সীর কথা বলব। 1892 সালে দাদাভাই নওরোজি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা বেশ কয়েকবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ম্যাডাম ভিকাজি কামা 1907 সালে জার্মানীতে ভারতের

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ওয়াদিয়া-রা (Wadia) বিখ্যাত ছিলেন নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে আর টাটা পরিবার ইস্পাতশিল্পে (Steel Industry) এবং বিজলী উৎপাদন (Hydro Electricity Project) করে বিখ্যাত হয়েছিল। টাটাদের উদ্যোগেই TISCO এবং TELCO কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। জামশেদজী টাটার বংশধররাই জামশেদপুরের মতো একটা সুন্দর শিল্পনগরীর পত্তন করেছিলেন। যারা এই শহরে চল্লিশ বা পঞ্চাশ-এর দশক থেকে আছেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, ভারতবর্ষে ওই সময়ে এতো সুন্দর ও পরিকল্পিত শহর বড় একটা দেখা যেত না।

ধনী পার্সী পরিবারের সদস্যরা জনহিতকর কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দোরাবজী টাটা ট্রাস্ট ব্যাঙ্গালুরুর Indian Institute of Social Science -র মতো শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মুম্বইতে দেশের প্রথম ক্যানসার হস্‌পিটাল-Tata Memorial Hospital স্থাপন। এই শহরেই Tata Institute of Social Science (TISS), Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপনা করার জন্য খ্যাত। তাতে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য পার্সীদের অনেক অবদান আছে।

ব্রিটিশ সরকার চল্লিশের দশকে তিনজন বিখ্যাত পার্সী ব্যক্তিত্বকে সমাজসেবামূলক কার্যকলাপের জন্য নাইটহুড প্রদান করেছিলেন। তারা হলেন জামশেদজি জিজিবয়, দিন্‌শ পেটিট এবং কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর। এঁদের তিনজনের নামে আজকের মুম্বাই ও পুনাতে বহু জনহিতকর সংস্থা গড়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক চিকিৎসকেরা ডাঃ রুস্তম ভকিলকে হৃদরোগবিদ্যার জনক হিসাবে অভিহিত করেন। ভারতবর্ষের প্রথম পরমাণু বৈজ্ঞানিক ডাঃ হোমি ভাবা-র অবদানের জন্য তাঁর নামে পরবর্তীকালে Bhaba Atomic Research Centre (BARC) প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা করা হয় Trombay-তে। পাশ্চাত্য যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে Zubin Mehta-র নাম কে না জানে? উনি পাঁচ দশকের বেশি পৃথিবীর বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা কোম্পানিগুলি conductor হিসাবে পরিচালনা করেছেন। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে ফিরোজ গান্ধি, পিলু মোদি-রা যেমন খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তেমনই আইনজ্ঞ হিসাবে সোনি দোরাবজি-র মতো লোকেরা প্রশংসা কুড়িয়েছেন। খেলাধূলার জন্য বিশেষ করে ক্রিকেটের মাঠে নরি কন্ট্রাকটর, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার বা রুসি সূর্তিকে ক্রিকেট প্রেমীরা একনামে চেনে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সব কৃতী পার্সীদের নাম বলতে গেলে একটা বই লেখা হয়ে যাবে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও পার্সীদের অবদান অসাধারণ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম ফিল্ড মার্শাল S. H. F. S. Manekshaw বা Sam মানেক্‌শ-কে সব ভারতবাসী

একনামে সবাই চেনে এবং শ্রদ্ধা করে। এঁর নেতৃত্বে ভারতীয় স্থলবাহিনী তেরো দিনের যুদ্ধে 1971 সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং 93,000 পাকিস্তানী সেনাকে বন্দি করেন। ইদানিংকালে কোনও যুদ্ধে এত Prisoners of War (POW) ধরা পড়েনি। ওঁর অসামান্য কর্মকুশলতা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের জন্য জাতীয় সরকার ওঁকে পদ্মভূষণ প্রদান করে পুরস্কৃত করেন। স্যামের নেতৃত্বে এবং দক্ষ পরিচালনার জন্য আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিশ্বের প্রথম সারির সেনাবাহিনী বলে গণ্য করা যায়। 2005 সালে ইন্দিরা গান্ধি মুক্তবিদ্যালয় (IGNOU)-র সমাবর্তন উৎসবে স্যাম মানেকশকে সাম্মানিক Ph.D দেওয়া হয়। 92 বছর বয়সে বৃদ্ধ মানেকশ বলেছিলেন যে উনি 5 ভাইবোনেদের মধ্যে সবথেকে কম শিক্ষিত। ওঁর চিন্তা হল যে, উনি Ph.D হলে কিভাবে সম্বোধিত হতে চাইবেন?—ফিল্ড মার্শাল মানেকশ না ডাঃ মানেকশ? উনি হেসে বললেন যে ফিল্ড মার্শাল হিসাবে সম্বোধিত হলেই বেশি খুশি হবেন।

এরপর বলব ডাঃ নৌশের হোসবিই অ্যান্টিয়া (N.H.Antia)-র কথা। আমি প্রথম ওঁর সংস্পর্শে আসি 1981 সালের মার্চ মাসে। উনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (JNU) একটা সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতে এসেছিলেন। Dr. Antia একটা সাধারণ খদ্দরের পাঞ্জাবী ও পায়জামা এবং পায়ে একটা চপ্পল পরে এসেছিলেন। সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময়ে আমাদের নানা জায়গায় বহুবার দেখা হয়েছে। যেমন দিল্লি, পুনে, কলকাতা বা রাজস্থানের জয়শলমীরে—কিন্তু কোন সময়েই ওঁর পোশাকের পরিবর্তন দেখিনি। উনি ছিলেন সত্যিকারের গান্ধিবাদী এবং মানবিকতার প্রতীক। উনি পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে বিলেতে গিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে FRCS পাশ করেন এবং তারপর প্রায় 9 বছর ওখানে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষানবিশি করেন। উনি দেশে ফিরে এসে অগ্নিদগ্ধ (Burns) রোগীদের জন্য ভারতবর্ষে মুম্বাইতে প্রথম Burns Unit শুরু করার পথিকৃত। পরবর্তীকালে উনি পুনঃনির্মাণ শল্যচিকিৎসা (Reconstructive এবং Plastic Surgery) বিভাগটি উনি মুম্বাইয়ের J. J. Hospital-য়ে শুরু করেন। এর জন্য আজকে ওঁকে Plastic Surgery-র জনক বলা হয়। উনি শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে বহু কুষ্ঠরোগীকে পুনর্বাসন বা rehabilitation-এ সাহায্য করেছেন। সত্তর দশকের শেষ দিকে উনি প্রথম উপলব্ধি করেন যে, আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হলে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির কথাও বিবেচনা করতে হবে। ঐ সময়ে উনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা (Primary health care) এবং পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য আন্দোলনের (Health for All বা HFA) সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য উনি নিজে দু'টো বেসরকারী সংস্থার (NGO) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দু'টো সংস্থার নাম হোল Foundation for

Medical Research (FMR) এবং Foundation for Research in Community Health বা FRCH। এই সংস্থাগুলির গবেষণার ফল হোল Community Health Workers' Scheme (CHW)-যেটা পরে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক (MOHFW) CHW স্কীম হিসাবে চালু করে। চিন দেশ তারপরেই Barefoot Doctors' Scheme আরম্ভ করে। Dr. Antia-র NGO তৃণমূলস্তরে বা grassroot level-এ গবেষণা করে দেখায় যে গ্রামাঞ্চলে CHW-এর মাধ্যমে প্রাথমিকস্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছান যায়। এ বিষয়ে ওঁর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রবন্ধ কয়েকটা বিশ্ব বিখ্যাত স্বাস্থ্য পত্রিকাতে—যেমন Lancet বা British Medical Journal (BMJ)-তে প্রকাশিত হয়েছিল। চিনের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা Dr. Antia-কে তাঁর অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলার জন্য পরপর দু'বছর ওঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

দেশে বিদেশে ওর জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণামূলক কাজের জন্যে উনি পদ্মশ্রীসহ অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন। উনি ছিলেন সদা হাস্যময় এবং সরল প্রকৃতির নিপাট ভদ্রলোক। 2005 সালে উনি মারা যান। ওঁর মারা যাবার কয়েকমাস আগে রাজস্থানের জয়শলমীরে একটা কনফারেন্সে আমার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি হেসে বলেছিলাম—''স্যার, আপনি দেশের সব মানুষের জন্য কিছু করুন''। উনি শুধু স্মিত হেসেছিলেন, কোন জবাব দেননি। আমি ছিলাম ওঁর স্নেহধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

এই দু'জন ছাড়াও চাকরি জীবনে আমার আরো কয়েকজন বিখ্যাত পার্সী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ জঙ্গলওয়ালা (Dr. Jungalwala), লেঃ জেনারেল আদি সেঠ্না এবং ওঁর মেয়ে ডাঃ শেহনওয়াজ কামা। ডাঃ জঙ্গলওয়ালা ছিলেন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের Additional Director General, Health Services। ষাট দশকের শেষের দিকে উনি 4-5 বছরের জন্য জেনেভা-তে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটা উচ্চপদে যোগদান করেন। লেঃ জেনারেল আদি সেঠ্না সত্তর দশকের মাঝামাঝি ছিলেন ভারতীয় স্থলবাহিনীর উপ সেনাধ্যক্ষ বা Vice Chief of Army Staff (VCOAS) উনি অবসর গ্রহণের পরেও দেশের বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।

অবসরান্তে জেনারেল সেঠনা এবং তাঁর মেয়ে ডাঃ সেহনওয়াজ কামা মিলি একটা বেসরকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম হোল PAR-ZOR Foundation (Parsi & Zoroastrian Foundation)। ঐ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল পার্সী সম্প্রদায়ের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা এবং ভারতবর্ষে পার্সীদের জনসংখ্যা আর যেন না কমে যায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা। পার্সীদের সামগ্রিকভাবে উন্নতির জন্য PAR-ZOR-কে UNESCO এবং ভারত সরকার সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আর্মিতে চাকরি করার সুবাদে আমার সঙ্গে বেশ কয়েকজন পার্সী অফিসারের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরমধ্যে সবথেকে অন্তরঙ্গ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মিনু ইঞ্জিনিয়ার। উনি নিজে একজন হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করায় পার্সী সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছর আগে উনি আমাকে পার্সীদের কতগুলি ইতিবাচক গুণের কথা বলেছিলেন। যেমন পার্সীরা সংখ্যালঘু হলেও ভারত সরকারের কাছে কখনও Minority Status-এর অধিকার দাবি করেনি। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন ব্যাপারেই সরকারের বিরোধিতা করেনি—সেজন্য একজন পার্সীকেও সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়নি। দেশের প্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য ওরা সব সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ধনী পার্সীরা সমাজের উন্নতিমূলক কাজের জন্য সব সময় এগিয়ে এসেছে।

পার্সীরা অগ্নির উপাসক। আমার, পুনে ও মুম্বই'তে থাকাকালীন, বেশ কয়েকটা Fire Temple বা পার্সীদের মন্দির দূর থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। পার্সী ধর্মের মূলনীতি হোল সততা এবং কঠিন পরিশ্রম করা। যেজন্যে ওদের মধ্যে হীনম্মন্যতা বা নোংরামি বড় একটা দেখা যায়না। ওদের মনের স্বচ্ছতা, মানবিকতা এবং পরোপকার করার প্রবণতা চোখে পড়ে। এমনিতে ওঁরা খুব স্পষ্টবাদী এবং ওদের বন্ধুত্বের উষ্ণতা সহজেই বোঝা যায়। আমার মনে হয় যে ওঁরা স্নেহ ও ভালবাসার প্রতীক।

ভারত সরকারের সংখ্যা লঘুসম্প্রদায় মন্ত্রক (Ministry of Minority Affairs) সম্প্রতি একটা উদ্যোগ নিয়েছে যার নাম হোল 'জিয়ো পার্সী' (Jio Parsi Project)। এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হোল—পার্সীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এবং এদের জনসংখ্যা অবনমনের থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আলোচনা করে ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কলকাতায় কয়েকদিন আগেই একটা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন জায়গায় অদূর ভবিষ্যতে আরো কর্মশালার আয়োজন করতে হবে Jio Parsi Project-এর তরফে। Tata Institute & Social Science (TISS) বেশ কয়েক বছর ধরেই এ ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে—যার মধ্যে পার্সীদের সমাজ কাঠামো, প্রবীণ সদস্যদের সমস্যা, যুব সম্প্রদায়ের জীবিকা এবং এই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে TISS ভারত সরকারের মন্ত্রককে তাদের পর্যবেক্ষনলব্ধ পরামর্শ প্রদান করেছে।

'জিয়ো পার্সী' পরিকল্পনার (Project) মুখ্য সুপারিশ (recomndation) হোল যে তরুণ পার্সী বিবাহিত দম্পতিদের আরো বেশি সন্তানসন্ততির জন্ম দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। দরকার হলে পার্সী বিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য counselling (পরামর্শ) এবং কর্মশালার ব্যবস্থা করা হবে।

'জিয়ো পার্সী' পরিকল্পনা এবং কার্যে পরিণত করার উপর পার্সী সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে।

পরিশেষে বলব যে, ভারত সরকারের (Jio Parsi Project) জিয়ো পার্সী পরিকল্পনা, সরকার ও UNESCO-র সহযোগিতায় এবং PAR-ZOR Foundation এর উদ্যোগে পার্সীদের জনসংখ্যা অবনমনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা যেন সার্থক হয়। বুদ্ধিমান এবং দায়িত্বশীল পার্সীরা যেন আগের মতো দেশের অগ্রগতির জন্য এগিয়ে আসেন। ওদের দ্রুত পুনরুদ্ধার আমরা অদূর ভবিষ্যতে আবার যেন দেখতে পাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

Parsi on the verge of extinction–Prof. Asish Bose

The Parsis, Their History, Religion & Contribution to Indian Society—H. Darwala

এক।। ঘাস ফড়িং : অনুগল্প—অলোক ঘোষ/প্রকাশক : নবীনা; মূল্য 50 টাকা

ছোট থেকেও ছোটতর পরিসরে গল্প বলার কথক ছিলেন বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)। তখন অনুগল্প বলা হত না—আমরা বলতাম পোস্টকার্ড সাইজ গল্প। ক্ষীণকায় হলেও সেগুলো গল্পই ছিল—কোনও 'আণবিক' বিশেষণে ভূষিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', ছোট গদ্য লেখা হলেও, স্বাদে-গন্ধে তা একেবারেই আলাদা জাতের। অনুগল্প নয়।

অলোক ঘোষের 'ঘাস ফড়িং' পড়তে পড়তে মনে ধন্দ জাগে এই গ্রন্থিকাটি কি লিপিকা-ধর্মী গদ্যে কাব্য, না কাহিনিহীন কাব্যে লুকনো গল্পের বীজ? এই নতুন ধরণের লেখা---ব্যঞ্জনাময় ছোট ছোট বাক্যে মনের অলি-গলির আলো-আঁধারের নকশা—সংজ্ঞায়িত করা সত্যিই কঠিন।

উনিশটি—(কী বলব, অনুকাব্য না অনুগল্প?—সে যাই হোক) ব্যক্তিগত অনুভব লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেই সব অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে—আবার উদ্বিগ্নও করে। কেন লেখক প্রায় প্রতিটি লেখায় 'মা' বা মা'য়ের প্রতীক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন? ইনি কি গর্ভধারিণী মাতা না জগন্মাতা? যেসব 'তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে' (পৃ:৩০) তে —'এখন বীভৎস হয়ে উঠল মায়ের মুখটা। যেন রাক্ষুসি।' অথবা 'মা, তোমাকে সাজিয়ে দিলাম।... আমার গর্ভধারিণী জগদ্ধাত্রী মা। আজ তুমি যাবে অনেক দূরে।... (ঈশ্বরের বাগানে এক রাত)। এই মা যিনিই হোন—খুবই চিন্তার কথা।

শেষের তিনটি লেখায় গল্প হয়ে ওঠার স্পষ্ট 'আণবিক' আভাস আছে।

দুই।। চিত্রপটে আঁকা : চন্দনা দত্ত/প্রকাশক : সমতট প্রকাশনা; মূল্য 150 টাকা

কিছু গল্পের বই আছে যা প্রথম দর্শনে অত্যন্ত মামুলি বলে মনে হয়। প্রথম পঠনেও, দু'একটি গল্প ছাড়া, আহামরি কিছু মনে হয় না। কিন্তু ওই দু'একটির টানে দ্বিতীয় পঠনে মনে হতে থাকে—হ্যাঁ, 'আলো আসিতেছে'। শ্রীমতী চন্দনা দত্তের 'চিত্রপটে আঁকা' এরকমই একটি ছোট গল্পের বই—যার রসগ্রহণ করতে গেলে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেলে ঠকতে হবে।

জীবন বহুরূপী। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ধরন। জানি না। 'জীবনের পটে কে ছবি আঁকিয়ে যায়...'। সেই পটে আঁকা চিত্র কখনো বৃষ্টির জলে-ভেজা বিবর্ণ, কখনো রৌদ্রকরোজ্জ্বল। নির্মম বেদনায়, অসহ্য আনন্দে, কিংবা নীরব উপেক্ষায় সেই সব জীবন চিত্রিত। বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন শ্রীমতী দত্ত। গল্পের মতো, তবু শুধু গল্প নয়—খণ্ড ইতিহাস যেন। মানে, গালগপ্পো নয়—কঠোর বাস্তব।

উনিশটি কাহিনি নিয়ে এই গ্রন্থ—যেন এক বিশাল পোর্ট্রেট গ্যালারির ক্ষণদর্শন। বিচিত্র চরিত্রের চলমান মিছিল। আখ্যান বিভিন্ন, কিন্তু সবার মধ্যে, এক অন্তর্লীন সূক্ষ্ম সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন নামে লেখিকা নিজেই যেন ছড়িয়ে আছেন চরিত্রগুলোর মধ্যে। হয়তো আত্মকথন বলা যাবে না—কিন্তু সবই তাঁর অনুভূতির ফসল। তাঁরই অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব।

শ্রীমতী দত্তের অভিজ্ঞতার পটভূমি এবং তা আঁকার ক্যানভাসের ব্যাপ্তিও বিশাল। অর্ধেকের বেশি পৃথিবীতে তার কাহিনি ছড়ানো। একই গল্পে (আসা-যাওয়ার পথের ধারে) অনায়াস উল্লেখ দেখতে পাই ফ্লোরিস-শিকাগো-বস্টনের সঙ্গে বুড়িগঙ্গার তীরে সদরঘাট, রেফিউজি কলোনি থেকে কালটিভেশন অব সায়েন্সের লোহার গেট। শুধু স্থানের নয়, কালেরও পটপরিবর্তন হয় নির্দ্বিধায়। আধুনিক সময়ের ম্যান্‌হাটান থেকে অনতি-অতীতের অভিজাত বাঙালি বাড়ির কিস্‌সায় (নয় নয় এক মধুর খেলা)

স্মৃতিচারণমূলক গল্পগুলোতে লেখিকা স্মৃতি সতত সুখের কাহিনি শোনান না। সব কাহিনির গভীরে আছে বিষাদের ছায়া। সেটা কি নিষ্করুণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নারীর দৃষ্টিতে দেখার জন্য, না কি ভিটে-মাটি ছেড়ে আসার আদি বেদনাবোধ থেকে জাত? অথবা 'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো...' সেই জীবনের পথে চলতে চলতে চরিত্রদের পা নুড়ি পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত—অতএব ছবি চিত্রপটে আঁকতে গেলে তাতে রক্তের ছিটে তো লাগবেই।

ফলে আখ্যানের ভাষা প্রায়শই একটু বেশি গুরুগম্ভীর, একটু বিষন্ন মনে হয়। আরেকটু সরসতা থাকলে যেন ভাল হত।

আসল কথা—'চিত্রপটে আঁকা' পড়তে ভাল লাগে। পাঠককে ভাবায়। আমাদের ঋদ্ধ করে।

সমালোচক : মনোজ রায়

বাড়ির ছাদ লিক্‌প্রুফ করবার আধুনিক উপায়

অনিমেষ কুমার সাহা *

'জল' এমনই একটা শব্দ যার অপর নাম 'জীবন'। আবার বর্ষাকালে অবিরাম ধারায় ঝরা এই জল-ই আমাদের জীবন হানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছোটবেলায় আমরা পুঁথিগত বিদ্যায় জেনেছি যে ছ'টি ঋতুর মধ্যে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষা ঋতু বা বর্ষাকাল বলে। যদিও বর্তমানে আমরা সেই চিরাচরিত বর্ষাকালকে সময়মত দেখতে পাই না। বর্তমানে বর্ষাকালের ব্যাপ্তি আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস ছাপিয়ে প্রাক্ দুর্গাপুজো পর্যন্ত হাড়ে হাড়ে অনুভূত হয়। কিন্তু আবহবিদরা শেষের দিকের বর্ষা বা অসময়ের বর্ষাকে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণ হিসাবে দর্শায়। কারণ সে যাই হোক না কেন, সময়কালে বর্ষার যে প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই বর্ষা যদি কখনও তীব্র আকার ধারণ করে অর্থাৎ বন্যার রূপ নেয়, আর সেই বন্যার কারণে যদি দেশের ও দশের চরম ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বর্ষাকালকে আমরা কখনও-ই চাইব না। অতিরিক্ত বর্ষার কারণে দেশের ও দশের নানাবিধ ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে আমরা কম-বেশি জড়িত। এই বর্ষায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ সমস্যা হয়। সেই সমস্যা ছাড়াও ঘর বাড়ির ছাদের কি কি সমস্যা হয় এবং সেই সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেই সম্পর্কে আলোকপাত করবার জন্য আমার এই কলম ধরা।

বসবাস করবার জন্য মানুষের প্রয়োজন একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের সর্বোচ্চ তলায় যাঁরা বাস করেন তাদের সব সময়েই রোদ-বৃষ্টির কথা মাথায় রাখতে হয়। পুরনো বা নতুন বাড়ির ছাদে যদি Water proof treatment না করা থাকে বা ছাদ ঢালাই এর সময়ে কংক্রিটকে সঠিকভাবে compaction না করা হয় বা ঢালাই এর পরে shuttering খোলার সময়ে ছাদের নিচে অর্থাৎ সিলিং-এ Honey comb দেখা দেয় বা ছাদের উপরে ছোট ছোট crack (ফাটল) দেখা যায়, তবে সেই সব বাড়ির নিচের তলায় বর্ষার সময়ে জল পড়বে না কেন? এই সব সমস্যা থাকলে স্বয়ং ভগবানও ঘরের ভিতরে ছাদের জল পড়াকে বন্ধ করতে পারবেন না। তাই ছাদকে leak proof করতে হলে কারুর মাথাব্যথা না থাকলেও বাড়িতে বসবাসকারীর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ওই

*সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, আই. আই. টি, খড়্গপুর ; বাড়ি : ই. ই. ২০৮/৮, সল্টলেক, কলকাতা

ছাদই তাঁর মাথা ব্যথার প্রথম এবং প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই ছাদকে লিকপ্রুফ করতে হলে কি কি করা দরকার সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

ছাদকে লিকপ্রুফ করবার জন্য নানা মুনির নানা মত। কিন্তু বাড়ির মালিককে সঠিক ব্যক্তির কাছে গিয়ে সঠিক পদ্ধতি বেছে নিতে হবে যাতে তাঁর বাড়ির ছাদে কি কি উপায়ে ট্রিটমেন্ট করলে সেটা বেশি বছর লিকপ্রুফ থাকবে। আমাদের শরীরে কোনও রোগ হলে আমরা যেমন ডাক্তারের পরামর্শ নিই, তেমনি বাড়ির ছাদ দিয়ে ঘরের ভিতরে জল পড়া বন্ধ করবার জন্যও উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন হয়। এর জন্য আমরা ঘর বাড়ির চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। বাড়ির চিকিৎসক হল আমাদের দেশের অভিজ্ঞ কোনও সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, কোনও রাজমিস্ত্রী নয়। ছাদের উপরে Water Proof Treatment করার ব্যাপারে আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এখন মোটামুটি বলতে পারি কোন্ ছাদে কোন্ ধরনের Treatment হওয়া প্রয়োজন।

কংক্রিটের ছাদ, তা সে যে কোনও আকারে তৈরি হোক না কেন, সবকটিতেই Water Proof Treatment হওয়া প্রয়োজন। যে সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেই সব জায়গার ছাদ সাধারণত Inclined বা Dome এর আকারে করা হয়, যাতে বৃষ্টির জল ছাদে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না পারে। এই জাতীয় ছাদকে Leak Proof করতে হলে প্রথমে ছাদকে ভাল করে স্টীল ব্রাশ দিয়ে ঘষতে হবে। ঘষার পরে ওই ছাদকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরপরে জল দিয়ে ওই ছাদকে ধুয়ে নিয়ে ছাদের সারফেসকে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো ছাদের উপরে এক ভাগ সিমেন্ট ও এক ভাগ Bonding agent-এর মিশ্রণ ভাল করে লাগাতে হবে। এই মিশ্রণটা লাগানোর প্রায় 15 মিনিট পরে মোটা দানার বালি অর্থাৎ coarse sand ওই ছাদের উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বালি ছড়ানোর উদ্দেশ্য হোল Bonding agent-এর coat এর পরবর্তী coat অর্থাৎ Water proofing compound যুক্ত plaster (এক ভাগ সিমেন্টের সাথে দুই ভাগ বালি ও পরিমাণ মতো Water Proofing Compound মেশাতে হবে) যাতে ছাদের সাথে ভাল করে Bonding হয়। এইভাবে ছাদের treatment করা হলে ওই বাড়ির ছাদ থেকে আগামী 5-6 বৎসর কোনও লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

আগেকার দিনে বাড়ির ছাদে যে ধরনের Water Proof Treatment করা হতো, সেটিকে আমরা জলছাদ বা Lime Terracing বলে থাকি। ওই ধরনের ছাদের আয়ু সাধারণত: 10-12 বৎসরের মতো। এই ধরনের treatment-এ তৈরি ছাদ এত পুরু হতো যে ওই ছাদের Water Proofing Treatment-এর সাথে সাথে ওই ছাদের নিচের তলায় অবস্থিত ঘরগুলির তাপমাত্রাও গরমের দিনে অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই ধরনের treatment করতে যে কোয়ালিটির লাইম দরকার সেটা এখন পাওয়া দুষ্কর এবং ব্যয়বহুল। এছাড়া এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয়

অন্যান্য সামগ্রীও যথাযথভাবে পাওয়া দুষ্কর। সর্বোপরি এই কাজ করবার জন্য যে লোকের প্রয়োজন আজকাল তাদেরও আর পাওয়া যায় না। হয়তো সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে এদের কয়েকজনের দেখা মিললেও আজকাল তারা এই কাজ করতে চায় না।

এই কাজ করবার জন্য কেন বিশেষ ধরনের লোকের প্রয়োজন হয়, সেই বিষয়ে কিছু বলা যাক। জলছাদ পেটানোর সময় ওরা এক লাইন ধরে ছাদের উপরে বসে সাঁওতালী ভাষায় গান গাইতে গাইতে ছাদ পেটায় এবং পেটাতে পেটাতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে পেটানোর ফলে ছাদ থেকে দুধের ক্রিমের মত দেখতে এক ধরনের লাইম পেস্ট ওই ছাদের সারফেসে উঠে আসে। এই ক্রিম যতক্ষণ না বার হয় ছাদ পেটানো ও তার সঙ্গে গান গাওয়া চলতে থাকে। অন্য ধরনের মানুষজনকে দিয়ে এই কাজ করানোর চিন্তা হলেও গান গাওয়া ও পেটানোটা একদমই সম্ভব নয়। এবার ওই ক্রিমকে ছাদের উপরের সারফেসে ভালভাবে লেপে দিতে হবে অর্থাৎ ক্রিম দিয়ে ছাদকে polish করতে হবে। এই polish এর ফলে ছাদের top টা খুব smooth হবে। এই polish করার কাজ ততক্ষণই চলবে যতক্ষণ না top surface-টা একটু শক্ত হয়।

ছাদের লিক থেকে চট্‌জলদি বাঁচবার জন্য অনেক বাড়ির ছাদে Tarfelt লাগাতে দেখা যায়। এটা লাগানো খুবই সহজ। শুকনো ও পরিষ্কার ছাদে একটা Bituminous Priming Coat লাগিয়ে তার উপরে এই Felt টা লাগাতে হবে এবং এই Felt এর উপরে আবার Bitumin ঢেলে তার উপরে ছোট Granular মার্বেল বা মোটা দানার বালি ছড়িয়ে দিলেই ট্রিটমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ হবে। তবে এই ধরনের Treatment এর আয়ু মাত্র দুই থেকে তিন বছর। উপরন্তু গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে এই Felt নরম হয়ে যাওয়ার ফলে ছাদের উপরে চলমান ব্যক্তির জুতোতে সেটা লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং এর ফলে Surfaceটাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই Tarfelt-এর concept-কে কাজে লাগিয়ে এবং সামান্য পরিবর্তন করে বাজারে আর এক ধরনের Felt এসেছে যার নাম Polyfelt । এর কোয়ালিটি Tarfelt-এর থেকে বেশ ভাল। এটা বেশ শক্ত পোক্ত এবং মোটা ধরনের। সূর্যের প্রচন্ড তাপে অন্তত 40°C থেকে 50^0C পর্যন্ত এটা নরম হয় না বা সহজে গলে না। তাই ছাদের চলমান ব্যক্তির জুতোতে এটা আটকে থাকবে না। এই ধরনের Leak Proof Treatment কেও ইঞ্জিনীয়াররা সব সময়ে Recommend করে না। কিন্তু স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে বাড়ির ছাদকে লিকপ্রুফ করবার জন্য কোথাও কোথাও এই ট্রিটমেন্ট-ও সচরাচর হচ্ছে। এর আয়ু চার থেকে পাঁচ বৎসরের মতো।

বাড়ির ছাদকে সাত থেকে আট বৎসরের জন্য লিকপ্রুফ করতে হলে প্রায় সব সিভিল ইঞ্জিনীয়াররাই যে ধরনের Water Proof Treatment করার কথা বলে থাকেন, সেই ব্যাপারে কিছু Technical Tips দেওয়া যাক।

ছাদে যদি কোনও undulation থাকে বা ছোট ছোট cracks দেখা যায়, তবে সেগুলিকে মেরামত করে তারপর সেই ছাদের উপরে 35 মিলিমিটার পুরু একটা screed concrete-এর layer দিতে হবে। এই concrete এর মিশ্রণ হবে—এক ভাগ সিমেন্ট, দুই ভাগ বালি (Medium coarse) ও চার ভাগ পাথর কুচি (পাথরের সাইজ ছয় মিলিমিটার এর থেকে ছোট হলে ভাল হয়)। এই কংক্রিট করা হলে তার উপরে জল ঢেলে Curing করতে হবে অন্তত দশ দিন পর্যন্ত। দশ দিন বাদে ছাদের জল বার করে ছাদকে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর এই শুকনো ছাদের উপরে একই দিনে এক coat latex লাগাতে হবে। Latex এর মিশ্রণটা হল—1 লিটার Latex এর সাথে 3 লিটার জল ও 4 কেজি সিমেন্ট ভালো করে মেশাতে হবে। এই মিশ্রণ লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক পাশ থেকে Composite Mortar (অর্থাৎ এক ভাগ সিমেন্ট + দুই ভাগ মিডিয়াম কোর্সের বালি + ছয় ভাগ লাইম এবং এর মধ্যে Manufacturer-এর Specification অনুযায়ী Mastercrete-M 81 মেশাতে হবে) এর মিশ্রণটা লাগাতে হবে। এই মিশ্রণটা Latex এর মিশ্রণের উপরে লাগানোর উদ্দেশ্য হল পরের কোর্সের সঙ্গে ছাদের উপরে লাগানো কোর্সের মধ্যে একটা সুদৃঢ় Bonding করিয়ে দেওয়া। Mastercrete-M-81 লাগাবার পরে ছাদের Surface-এ Ponding করে নয় থেকে দশ দিন ধরে 2 ইঞ্চি পুরু জল জমিয়ে রাখতে হবে। এই জলের জন্য ছাদের curing টা যেমন ভাল হয়, তেমনি ছাদ দিয়ে নিচের তলায় কোনও জল লিক হচ্ছে কিনা সেটাও ভালভাবে উপলব্ধ হয়। দশ দিন curing হয়ে যাওয়ার পরে ওই ছাদের জলকে বার করে ছাদের সারফেসকে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পরে শুকনো ছাদকে পরিষ্কার করতে হবে। এই শুকনো ও পরিষ্কার ছাদে এক Coat Techoxy লাগাতে হবে। তার পরের দিন আর এক Coat দিতে হবে। তৃতীয় দিনে আরও এক Coat Techoxy লাগালে ছাদের উপরে লিকপ্রুফ করার operation-টা সম্পূর্ণ হয়। Techoxy Coat লাগাবার operation টা হল একটা Continuous process for 3 consecutive days. মাঝে কোনও গ্যাপ দিলে প্রসেসটা ভুলভাবে লাগানো হবে। আর ভুল কাজের ফল— কিছুদিন বাদে ছাদ থেকে জল পড়া। যাইহোক, Techoxy-র Final coat লাগাবার পরের দিন থেকে প্রায় আট দিন পর্যন্ত ওই ছাদে কোনও মানুষকে চলাফেরা করতে দেওয়া চলবে না বা ওই ছাদের কোনও জলও ঢালা চলবে না। ঠিকভাবে প্রত্যেক Step অনুসরণ করে Manufacturer specification অনুযায়ী কাজ করলে সাত আট বছর পর্যন্ত এই ছাদ দিয়ে কোনও লিক হবে না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঠিকভাবে ছাদের treatment করলে দশ বৎসর পর্যন্ত ছাদের লিকেজ এর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

2016 সালের Luc Hoffman পুরস্কার পেলেন ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। প্রতি দু'বছর অন্তর দুনিয়া-জোড়া ছান-বিন করে খুঁজে বার করা হয় পুরস্কার প্রাপকদের, যাঁদের কাজ শুধু ecosystemকে বাঁচিয়ে রাখাই নয়, সেই ecosystem এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গরীব এবং প্রান্তিক মানুষদের টিকিয়ে রাখার কাজে লাগা। International Union for Conservation of Nature এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই পুরস্কার পেলেন।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নামকরণ থেকে শুরু করে আজ দুনিয়া-জোড়া স্বীকৃতি আদায় করার কর্ণধার, মূলত নীরবেই কাজ করে চলেছেন, প্রায় 40 বছর ধরে। আজ তাঁকে ঘিরে একটি নতুন ধরনের দর্শন গড়ে উঠছে তাঁর অনুগামীদের উৎসাহে—কেমন করে 'ইকলজি' শিখতে হয়।

তবে পুরস্কার শ্রী ঘোষের কাছে নতুন নয়। 1990 সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের Global 500 Roll of Honour সম্মানে ভূষিত হন। এই স্বীকৃতি বিশ্বের শুধু পাঁচশো জন এমন মানুষকে দেওয়া হয়েছে, যাঁরা পরিবেশ-বান্ধব কাজ করে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টায় নতুন দিক-নির্দেশ করেছেন।

সমতটের লেখক হিসেবে ধ্রুবজ্যোতি তো আমাদের আদরের ছিলেনই, এবার আমরা গর্বিতও।

চিঠি

প্রিয় সম্পাদক,

সমতটের এক একটা সংখ্যা যেন অসাধারণ হয়ে ওঠে, অন্যগুলো হয়তো ততোটা নয়। এপ্রিল-জুন'16, 188 সংখ্যাটি আমার মতে সেইরকমই একটি অসাধারণ হয়ে ওঠা সংখ্যা। কয়েকটি লেখার কথা একটু আলাদা করে বলতে চাই।

আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে যে লেখাটি সেটি হলো 'কুম্ভমেলার অমৃত'— কৌশিকব্রত দে-র লেখা। কুম্ভমেলার বিষয়ে এদিক ওদিক নানা লেখাই চোখে পড়ে। সেগুলো পড়িও হয়তো, কিন্তু সেই সমস্ত গতানুগতিকের ভিড়ে কৌশিকব্রত-র লেখাটি খুবই স্বতন্ত্র। তার প্রধান কারণ অধিকাংশ মানুষ যে আস্তিক্য বিশ্বাস ও ধর্মবোধ নিয়ে কুম্ভমুখী হন, কৌশিকের যাত্রা ছিল তার থেকে পৃথক। তিনি কোনো পুন্যের লোভে কুম্ভে যাননি, গিয়েছিলেন মানুষের আনন্দের উৎসকে খুঁজতে। কিন্তু সেই খোঁজায় ধর্মমুখী মানুষের প্রতি তাঁর অন্বেষায় কোনো অশ্রদ্ধা ছিল না, যা একশ্রেণির 'তথাকথিত' নাস্তিকদের মধ্যে থাকে। যে কারণে সঙ্ঘবিহীন, আত্মঅনুসন্ধানী, আধুনিক মনের সন্ন্যাসী মানুষটির সঙ্গেও তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। কৌশিকব্রত, আপনার লেখা আগে আমরা পড়িনি, আপনি আরও লিখুন, এটা আমরা চাই।

জাহিরুল হাসানের 'মুসলিম নারী দেশে দেশে...' লেখাটিও খুব তথ্যবহুল, সমৃদ্ধ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার জানার আছে ওনার কাছে, যার উত্তর আমরা খুব একটা পেলাম না, সেটা হল সাধারণ বাঙালি মুসলিম সমাজে মেয়েদের কী অবস্থা এবং আধুনিকতার প্রশ্নে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? লিঙ্গবৈষম্যের যে সমস্যাগুলো আমাদের ভাবাচ্ছে সেগুলো নিয়ে বাঙালি মুসলিম মেয়েরা কী ভাবছেন? তাঁরা কী সামাজিক-ধর্মীয় অন্যায় শাসনের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছেন? প্রতিবাদ করছেন? মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কেই বা তাঁদের মতামত কী? আরও একটা কথা আমার খুব জানার ইচ্ছে করে, এই যে সারা বিশ্বজুড়ে আজ ধর্মীয় মৌলবাদীদের (হিন্দু/মুসলিম নির্বিশেষে) চোখ রাঙানি, জেহাদি দলগুলোর এখানে ওখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কিছু অসহায় নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলার চক্রান্ত, এগুলোর সম্বন্ধে ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মুসলিম সমাজে প্রতিক্রিয়া কী? শুধু মেয়েরাই নয়, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে, এগুলোর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট প্রতিবাদ উঠছে কী? উঠলেও সেগুলো চোখে পড়ছে না কেন? মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরই বা এবিষয়ে কী মত?

উনি লেখার শেষে অনেক বইয়ের মাঝে জাকির নায়েকেরও একটি বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন দেখলাম।

রেফারেন্স দেওয়া যেতেই পারে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাজে-ভালোর কোনো জায়গাই নেই, কিন্তু জাকির নায়েকদের মতো নির্লজ্জ ধর্মঘুঘুদের দেখে বড় ভয় হয়। বিশেষ করে, কোথায় যেন সেদিন পড়ছিলাম, আজকে বাঙালি মুসলিম সমাজের ওপর নাকি জাকির নায়েকের খুব প্রভাব। এটা তো হতেই পারে না যে সমস্ত মুসলিম সমাজের ওপরই ধর্মান্ধদের প্রভাব আছে, তাহলে এতো শিক্ষিত উদারমনের মানুষ মুসলিম সমাজ থেকে উঠে আসছেন কীভাবে? কিন্তু ভয়টা থেকেই যায়। জাহিরুল সাহেব বাঙলায় মুসলমানদের নিয়ে গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন। ওনার পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, উনি যদি এগুলো নিয়ে একটা আলাদা লেখা সমতটের পাঠকদের জন্য লেখেন তাহলে বড় ভাল হয়।

আরও একটা কথা এই যে, বার বার লিখছি জানতে ইচ্ছে করে, বুঝতে ইচ্ছে করে—এগুলো লিখতে বড় লজ্জা হয়। এতদিন পাশাপাশি থেকেও কেন আমরা পাশের বাড়ির মানুষটির মন জানছি না। এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন। হিন্দু হিন্দু রয়ে গেল, মুসলমান মুসলমান—ততো বন্ধু হলো না, এটা খুব দুঃখের।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা'-র ওপর লেখাটিও তথ্যবহুল। তাদের মধ্যে বিতর্ক/ততো সখ্যতা না থাকার কথাটিও সবার জানা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা নিয়ে এতো খোঁড়াখুঁড়ি, চর্চার কী কোনো দরকার আছে?

সবশেষে আমি সম্পাদকের লেখার প্রসঙ্গে (আনপড়ের ডায়েরি/অর্ঘ্য দত্ত) বলি, আমরা যারা অনেকদিন ধরে ওনার স্নেহের ছায়ায় সিঞ্চিত, তাদের কাছে এটা খুব বড়ো পাওয়া যে উনি স্মৃতি কথা লেখার জন্য কলম ধরেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই লেখাটির দিকে খুব বেশিভাবে চেয়ে আছি। তার প্রধান কারণ ওনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভান্ডার আর অজস্র অন্যধরনের মানুষ ও বড়োমাপের মানুষের সঙ্গে ওনার পরিচিতি। সেইসব দ্যুতি-ঠিকরানো মানুষের কাহিনী আমরা শুনতে চাই। তিনি যখনই গল্প বলা শুরু করলেন ব্যস আমরা আর লেখা নয় ছবি দেখার যেন স্বাদ পেলাম।

ধন্যবাদ,

অনিন্দ্য রুদ্র
কলকাতা-6

বিশ্বভারতীর বই

BLACK HOUSE কালোবাড়ি Rs. 1400.00
Project Visualized and editorially facilitated by
Sanjoy Kumar Mallik

THE PEACOCK IN SPLENDOUR
Rs. 2500.00 (for SAARC countries) / $ 150.00
B. M. Deb
Science, Literature and Art in Ancient & Medieval India

WANDERLUST 450.00
Travels of the Tagore family
Translated & Edited by Somdatta Mandal

TOWARDS TAGORE Rs. 1500 .00
Edited by Sanjukta Dasgupta, Ramkumar Mukhopadayay &
Swati Ganguly

THE POET AND THE SCIENTIST 200.00
Edited by Partha Ghosh
রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের চিঠিপত্র এবং সংলাপ, সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি ও সম্পাদকের বিশ্লেষণ।

রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ ৪০০.০০
অশোক সেন

রবীন্দ্রসপ্তাহ ভাষণ ২০০.০০
সম্পাদনা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অর্মত্য মুখোপাধ্যায়
১৪২২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রসপ্তাহে (২৩-২৮ শ্রাবণ) উপস্থাপিত আলোচনাগুলির সংকলন

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ২০০.০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কালানুক্রমিক রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম থেকে ৫ম খণ্ড
প্রতি খণ্ড ১০০০.০০
সম্পাদনা গৌতম ভট্টাচার্য

বাল্মীকি প্রতিভা (সিডি অ্যালবাম) ২৫০.০০
অপ্রচলিত প্রথম স্বরলিপির পাঠ ও গীতরূপ
প্রয়োগ ঃ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা কেন্দ্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭ □ ফোন ঃ ২২৯০-৯৮৬৮; ফ্যাক্স ঃ ২২৯০-৭৮৫৫
বিক্রয়কেন্দ্র ঃ ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩ □ ফোন ঃ ২২৪১-৮৫৬০ □ ২১০ বিধান সরণি। কলকাতা ৬
Website : www/vbgv.in □ c-mail : director@vbgv.in / vbgvsales@gmail.com

সংসদ -এর বই

মিহির সেনগুপ্ত
বিদুর ₹ 225
যুদ্ধান্তে ₹ 200

সমীর সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন ₹ 350
রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশিরা ₹ 1000

সম্পাদনা:প্রণতি মুখোপাধ্যায়, অভীককুমার দে
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : মাসিক বসুমতী ₹ 800

ডা. শ্যামল চক্রবর্তী
রবিঠাকুরের ডাক্তারি ₹ 150

সংকলন ও সম্পাদনা : সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন ₹ 500
এক অমীমাংসিত সংলাপ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ₹ 250

ডা. শঙ্করকুমার নাথ
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ₹ 500

দীপংকর লাহিড়ী
পরিবেশ:প্রকৃতির প্রথম সন্তান ₹ 200
Environment : The First Child of Nature ₹ 200
বিলুপ্ত জনপদ ও প্রচলিত কাহিনী ₹ 175

মনোরঞ্জন গুপ্ত
রবীন্দ্র চিত্রকলা ₹ 250

চন্ডী লাহিড়ী
গগনেন্দ্রনাথ:কার্টুন ও স্কেচ ₹ 500

নিত্যানন্দ ভকত
নকশার গঠনশৈলী ₹ 250

এস. ইরফান হাবিব
(অনুবাদক : শান্তনু চক্রবর্তী)
ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগীরা ₹ 200
(ঔপনিবেশিক ভারতে বিপ্লব প্রয়াসের একটি অধ্যায়)

ডা. শ্যামল চক্রবর্তী
ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ₹ 225
বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞান-সাধক চুণীলাল বসু ₹ 180

অশোককুমার সিংহ
প্রবহমান বিজ্ঞান ₹ 250

গোষ্ঠ ন্যায়বান
গাছ বাঁচলে মানুষ বাঁচে ₹ 80

শুভেন্দু গুপ্ত
প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা ₹ 250

কল্যাণ রুদ্র
পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ সংকটের উৎস সন্ধানে ₹ 100
বাংলার নদীকথা ₹ 175

অনুপ দাশগুপ্ত
সেলুলার জেলে নির্বাসিত বিপ্লবীদের কথা ₹ 500

পীতম সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রজীবনে শিক্ষাগুরু ₹ 50

সংসদ-এর বই পাওয়া যায়
অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড জুনিয়র : পার্ক স্ট্রিট। স্টার মার্ক : লর্ড সিনহা রোড, সিটি সেন্টার, সাউথ সিটি, মনি স্কোয়ার। কথাশিল্প : কলেজস্ট্রিট।
বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম) : বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড। ☎ ০৩১২৮৬৯৩৯১/০১৭৩৩০৬৭০০৫

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন : ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫
ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৩৬০ ৩৫০৮
e-mail:ss_samsad@yahoo.in
Website:www.samsadbooks.com

সাহিত্য অকাদেমি

~ *আত্মজীবনী* ~

আমার জীবনস্মৃতি (অসমীয়া) ।। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
অনুবাদ : আরতি ঠাকুর ।। ৬০.০০

ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ (ভারতীয় ইংরেজি, পুরস্কারপ্রাপ্ত)
অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী ও পৃথ্বীশ সাহা ।। ১৭০.০০

উচল্যা (মরাঠী, পুরস্কারপ্রাপ্ত) ।। লক্ষ্মণ গায়কোয়াড়
অনুবাদ : মাধুরী সিংহ ।। ৯০.০০

আত্মচরিত (ওড়িয়া) ।। ফকীরমোহন সেনাপতি
অনুবাদ : মৈত্রী শুক্লা ।। ১২০.০০

জিপসি নদীর ধারা (পঞ্জাবী) ।। অজীত কৌর
অনুবাদ : জয়া মিত্র ।। ৬০.০০

শব্দ (ফরাসি) ।। জাঁ পল সার্ত্র
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য ।। ১১০.০০

সত্যের অন্বেষণ ।। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
অনুবাদ : গীতা চৌধুরী ।। ২২০.০০

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়
৪, দেবেন্দ্রলাল খান রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৫
দূরভাষ : ২৪১৯-১৬৮৩/১৭০৬; ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৪১৯ ১৬৮৪
বই-এর প্রাপ্তিস্থান
সাহিত্য অকাদেমি, ৫বি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলকাতা ৭০০ ০২৯
দূরভাষ ২৪১৯ ৮১০৯; দে বুক স্টোর, দে'জ পাবলিশিং,
ঊষা পাবলিশিং হাউস, বলাকা বুক স্টোর এবং মনীষা গ্রন্থালয়

Samatat Prakashan : 189
July-September 2016
Volume 48 ❑ Number 1

Annual Subscription : **Institution** : 1 Yr/2 Yrs.-Rs. 190/Rs. 380
Individuals **(by post)** : 2 Yrs/3 Yrs.-Rs. 250/Rs. 380
Individuals **(by hand from office)** : 2 Yrs/3 Yrs.-Rs. 160/Rs. 250

With best compliments from :

METAL ENGINEERING & TREATMENT COMPANY PVT. LTD.

Kolkata

R. N. 18270/69
Price per copy
₹ 20 only

Published, printed, owned by Arghya Kusum Datta Gupta, Kolkata - 700 029
Phone : 6561 9870, Mobile : 9830458933, E-mail : chhabik8@gmail.com ; printed by
Ayan Ghosh of UNIMAGE , [Phone : 2533 2956], 10, Roy Bagan Street, Kolkata - 6